গল্পের ঝর্ণা

প্রকাশক :

শ্রী প্রলয় কুমার জাটী

২৬, চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট

উত্তরপাড়া, হুগলী : পঃ বঃ।

ভূমিকা

১৯৫২ সাল থেকে সাহিত্যসেবা করে আসছি। উত্তরিত হয়েছি বহু সুখ দুঃখের প্লাবনে—পেয়েছি অনেক আনন্দ। পাঠকদের সেই আনন্দের অংশীদার করতেই গ্রন্থ প্রকাশে নিবেদিত হয়েছি।

এটী আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ। প্রথম বই "নূতন আস্বাদ" প্রায় নিঃশেষিত। সাহিত্য করে অর্থ উপার্জনে আমার ইচ্ছা নেই। এবারেও পুস্তক বিক্রয়ের কোন অভীপ্সা নেই। আগের বারের মত এবারেও অধিকাংশ বই পাঠাবো নিকটবর্ত্তী পাঠাগারগুলিতে সৌজন্যমূলক ভাবেই। [দূরবর্ত্তী কোন পাঠগারের সম্পাদক / গ্রন্থাগারিক চেয়ে পাঠালে বই পাঠাতে সচেষ্ট হব।] আর দেব সাহিত্যমনা বন্ধুস্বজনদের। বই দেব পড়তে আর সমালোচিত হতে।

এবারের সুবিধাটা আরো জোরালো। কেননা বইটী কিশোর পাঠ্য। দিতে পারবো স্থানীয় বিদ্যালয় গুলিতে-দিতে পারবো প্রিয় ছোটদের হাতেও।

এই বইয়ে দুটি ভাগ আছে। (১) চৈতুর গল্প (২) বাবুর গল্প। চৈতু হচ্ছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী চৈতালী আর বাবু হচ্ছে ভ্রাতুষ্পুত্র প্রণয়। গল্পগুলির প্লট সব তাদেরই-তাদের ছোট বেলায় বলা। আমি সেই গল্প গুলোকে প্লটমত সাজিয়েছি।

আমার পথের আলাপিত কন্যা প্রতিম স্নাতকোত্তর পাঠরতা দুই ছাত্রী (১) কুমারী মৌসুমী মণ্ডল (চন্দননগর) ও (২) কুমারী প্রতীষা ঘোষ (মনিরামপুর) এবং শ্রদ্ধেয় অগ্রজ সাহিত্যিক অমিয়-দা'র (শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার ঘোষ মহাশয়) কথামত ছোটদের জন্য এই লেখাগুলো—যা অনেকদিন আগেই মাঝে মধ্যে লেখা ছিল তা সংগ্রহ করে এক জায়গায় প্রকাশ করছি।

পাঠকদের, বিশেষ করে ছোটদের ভাল লাগলে শ্রম সার্থক হবে।

জন্ম।৭ই মে ১৯৩৭ সুশীল জাটী

॥ সূচীপত্র ॥

চৈতুর গল্প

বাঘের রুমাল

আমি আর পতু যাচ্ছি—রাস্তা দিয়ে—ঠিক রাস্তা নয়—মানে পিচ ঢালা বা খোয়া ঢালা নয়—তবু রাস্তাই—পায়ে চলা পথের চাইতে সামান্য চওড়া—

দুপাশে ঘন জঙ্গল—বিরাট বিশাল গাছও আছে, ঝোপঝাড় ওয়ালা মাঝারি বেঁটে-মোটারাও উপস্থিত—আবার যাকে বলে লতানে গুল্মজাতীয় গাছও আছে। এসব হলো পতুর বিষয়-গাছ নিয়ে তার বিষম ভাবনা।

আশেপাশের গরীব গুরবো কাঠুরেরা শুকনো ডালপালা ভেঙে নিয়ে যায় জ্বালানি হিসাবে।

পথ কখনো ওপরে, কখনো নীচে—আসলে একটা টিলো পাহাড়ের ওপর দিয়েই যাচ্ছি আমরা দুজন—বন্ধু আবার খুড়তুতো জাঠতুতো বোনও বটে—৫দিনের ছোট বড় তাই কেউ দিদি নই কেউ বোনও নই।

বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি। পতু সেজেছে রাজকন্যার মত। সে গোলগাল—গাল তার তুলোর মতন নরম আর ফর্সা—শীতের সময় ঝরে পড়া তুষারের পারা, ফারের কোট পরেছে-গরমের প্যান্ট পরেছে লালনীল ডোরাদার, পায়ে দিয়েছে পশমের মোজা, মাথায় পশমের টুপি—জুতোর পালিশ ঝকঝক করছে হাতে তার চকচক করছে নূতন এক হলুদ রুমাল।

আর, আমি কুমারী চৈতু-৯বছর ৭মাস ১২দিন বয়স আমিও

গরমের পোষাক পরেছি বটে-তবে তেমন কিছু আহামরি নয়। পতুরা তো আমাদের চাইতে বড়লোক। আমিও ফর্সা, তবে পতুর চাইতে দুইঞ্চি লম্বা তাই রোগা দেখায়। পায়ে মোজা নেই, ফুলপ্যান্ট নেই—চটি পরে চলেছি চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ শব্দ করতে করতে।

ভাবছেন-দুটো ছোট মেয়ে নেমতন্ন যাচ্ছে-তাদের বড়রা কোথায় গেল! তারা সব আগেই চলে গেছে। এই টিলাটার নীচেই বিয়ে বাড়ি—ওইতো দেখা যাচ্ছে তবুও অনেকটা পথ উঁচু জায়গা থেকে অনেকটা জায়গা দেখা যায়। বড়রা ভয় পায়না আমাদের ছেড়ে দিতে—কেননা এই সব জায়গা আমাদের খেলার জায়গা—রোজ এই পথেই ইস্কুলে যাই। আমরা দুজনেই চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি।

মজা হচ্ছিল এই ভেবে যে—আমরা দুজন সেইই দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি বিয়ে বাড়ি যাচ্ছি বলে। কিন্তু আসলে আমরা গেসলাম সেই ঝর্নার ধারে। ঝর্না দেখতে আমাদের দুজনেরই ভাল লাগে। বড়রা বারণ করে ওখানে যেতে-বাঘেরাও ওখানে আসে জল খেতে। আমরা কখনও বাঘ দেখিনি। ঝর্নার কাছে যাই-চুপ করে বসে দেখি।

অনেকটা-তা কুড়ি পঁচিশ ফুট ওপর থেকে জলটা লাফিয়ে নামে-তারপব তার দুধসাদা রঙের জল পাহাড়ের ঢল বেয়ে নেমে আসছে অনেকটা পথ-মাঝে মাঝে দেখা যায় না-ঝোপের আড়ালে পড়ে যায়। তারপর এখানে এসে হঠাৎ বড়সড় হয়ে প্রায় ৫ ফুট তলায় বেশ বড় গর্ত তৈরী করেছে—এখান থেকেই নদীর মত ধীর গতিতে নেমে গেছে নীচের দিকে। এই বড় গর্তটার কাছেই আমরা আসি।

জলের ওপর মনে হয় হাজার তারা ছোটাছুটি করছে। তলায় কাচের মত পরিস্কার জলের তলায় সাদা, লাল, হলুদ সব পাথর ঝিকমিক করে—মনে ভাবি হীরা, চুনী পান্না! নদীর দুপাশে নাম না জানা নানান গাছের ভিড়। বসে থাকতে থাকতে ঘুম পায় স্নিগ্ধ হাওয়ায়।

একবার এখানে একদল হরিণ দেখেছিলাম। আমাদের দিকে ওরা কেমন যেন অবাক চোখ মেলে দেখেছিল—আমরা দুজনও অবাক। কী সুন্দর যে লাগছিল! হঠাৎ পতু" কী সুন্দর দ্যাখ হরিণ ছানাটা" বলে আঙুল বাড়াতেই—হরিণেরা পলকের মধ্যেই অদৃশ্য!

আর একবার—খুব ভয় পেয়েছিলাম—আট নটা বরা এসেছিল জল খেতে। এরা খুব রাগী আর গোঁয়ার কাউকে ভয় পায় না দাঁতদিয়ে চিরে দেয়—বাবার মুখে শুনেছি। পতুকে মুখে আঙুল দিয়ে বসতে বলেছিলাম। বরাগুলো চলে যেতেই পালিয়ে এসেছিলাম।

আজ পথ শুনশান ফাঁকা। ঝর্ণাতলায় বসেছিলাম অনেকক্ষণ এখন সন্ধ্যে হবো হবো পতু বললো 'চৈতু, ভয় করছে"। আমি সঙ্গে সঙ্গে সাবধান—বললাম 'চুপ ভয় করলে ভয় নইলে কিছুই নয়'।

ততক্ষণে বাঘের গন্ধ পেয়েছি নাকে। বোঁটকা গন্ধ! বাবা বলেছে বাঘের গা থেকে বোঁটকা গন্ধ বের হয়। খুব ভয় পেলাম। কথা বলতে পারছি না। পতু দেখি, বনের দিকে তাকিয়ে। বড় বড় পাতা—পিছনে লতাপাতার ঝোপ—দুটো কচুপাতার মধ্যে দেখি, হলুদ কালো মুখে, বড় বড় সাদা গোঁফ—দুটো বিশাল চোখ—আমি জমে গেলাম। পতুও তাই। বাঘ বেরিয়ে এল। হলুদ কালো ডোরাদার বাঘ—বেশ বড়। ভাবলাম, ছুটি পা নড়লোনা—চেঁচাবো-আওয়াজ বেরুচ্ছে না। পতু পাথরের

মত স্থির—মনে মনে "হরি" নাম করছে হয়তো। বাঘ পতুর কাছে। পতুর চোখ বোজা। বাঘ পতুর ঝুলন্ত হাতের থেকে হলুদ রুমালটা টেনে নিয়েই এক লাফে বনে ঢুকে গেল।

বাঘ চলে গেছে—তবুও সময় নিলাম নড়তে। পতুর কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। ওর প্যান্ট ভিজে গেছে। পতু কাঁপছে। বললাম "বাঘ চলে গেছে পতু।"

পতু চোখ পিটপিট করছে—ধীরে ধীরে চোখ খুললো, বললো, 'আমার রুমালটা নিয়েছো' বললাম "দেখেছি"। পতু একটা পাথরে বসতে যাচ্ছিল—তার স্নায়ুতে আমার চাইতে বেশি চাপ পড়েছে। এখন তাকে বসতে দিলে চলবে না। তাড়া দিলাম চল তাড়াতাড়ি বিয়ে বাড়ি যাই।

ধীরে ধীরে সহজ হল পতু—সাহস ফিরে পেল—বললো "এ্যাই প্যান্ট পরে যাবো না বিয়ে বাড়ি।" বললাম "অন্ধকারে কেউ বুঝবে না পতু-তাছাড়া বাঘটা তো ওপরের পথেই গেল"।

পতু দ্রুত নামতে থাকলো। বিয়ে বাড়ির কাছে এসে বললো. "কাউকে বলিস না ব্যাপারটা—কেউ বিশ্বাস করবে না"। বললাম, "না পতু বাবাকে বলবোই—লোকে হাসেতো হাসুক বাঘ থেকে সাবধান করতেই হবে।"

ইস্কুলের পাশ দিয়েই রাস্তা। একটু এগুতেই দেখি, বাবা আমাদের দেখতে পেয়েই বাঘের মত গর্জন করে উঠলো। 'কোথায় ছিলিস এতক্ষণ।" আমি ভয়ে চুপ। পতু ভয়ে ভয়ে বললো "বাঘ"। বাবা পতুর অবস্থা দেখে বললো ,বাঘ—বাঘ মানে কী' ? আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "পাজি, চুপ কেন ? বল" ?

বললাম, 'ঝর্ণাতলায়' বাবা বললো, 'ঝর্ণাতলায় বাঘ ? সেখানে ছিলি' ? আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যা,

বাবা প্রশ্ন করলো "তারপর? কী হল তারপর"—বাবার পাশে এসে দাঁড়াল মা আর কাকিমা। দুজনেই পরীর মত সেজেছে। পতু ছুটে গিয়ে তার মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকালো। আমরও ইচ্ছে করছে—এখনও তো আমারও বুক ধড়পড় করছে-কিন্তু বাবার সামনে থেকে নড়তে পারছিনা। বাঘের সামনে পতুর মত অবস্থা।

বাবা জড়িয়ে ধরলো আমাকে। বুকে নিল মিথ্যা বলিনি। তারপর সহজ হতে বাবাকে বললাম, সমস্ত ঘটনাটা।

মা শুনে বললো, 'কী সর্বনাশ!' বলে বুকে টেনে নিল। পতু বললো, 'কেউ যদি বিশ্বাস না করে'? বাবাবললো." ঠিক বিশ্বাস করবে" বলে বাবা আমার হাত ধরে চলতে চলতে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো, "বানিযে বলিসনি তো মা।"

আমি বললাম, না বাবা। পতুর রুমালটা দাঁতে ধরে টান দিল-তারপর চলে গেল। পতু ভয়ে প্যাণ্ট ভিজিয়ে ফেলেছে।" বাবা বললো." তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই—বহু মানুষ বাঘ দেখেই অজ্ঞান হয়ে যায়। তবে মিথ্যে বলে ঝর্ণাতলায় যাওয়াটা ঠিক করনি।'

বললাম, "আমার যে ভীষণ ভাললাগে ওইখানে গিয়ে বসে থাকতে।" "বাবা বললো ' তাহলেও বড়রা কেউ না থাকলে ওখানে যাবে না"। আমার ভয় কেটে গেছে—বাবা সঙ্গে রয়েছে তো—বাবার গায়ে বিষম জোর। বাবাকে গ্রামের সবাই মানে।

ওখানে গিয়েই খেতে বসে গেলাম। মা, কাকীমা, আমি পতু। বাবা, কাকারা, পরে খাবে। সবাইকে বাঘ থেকে সাবধান করেছে।

কতজন বিশ্বাস করেনি। আমাদের কাছে এসে প্রশ্ন করছে।

সবাই ভাবছে বানিয়ে বলেছি।

খাওয়ার পরে হাত ধুয়ে পতুর মনে পড়লো রুমালটার কথা। হঠাৎ দেখি, রতুদির হাতে হলুদ মত একটা রুমাল। পতুকে দেখালাম। গেলাম রতুদির কাছে।

রতুদি মানে রত্নাশ্রী হলো আমাদের গ্রামের সবচেয়ে ধনী রতনলাল শেঠের কন্যা—দশম শ্রেনীতে পড়ে—সিনেমার নায়িকাদের মতো সুন্দরী। রতুদি আমাদের দেখে হাসলো, বললো, "এটা কাপড়ের রুমাল নয়—হরিণের চামড়ার—শ্যামওয়ে হরিণের চামড়ার রুমাল। দ্যাখ কী নরম।" পতু হাত দিল, বাঃ চমৎকার। আমি দেখলাম, বেশ নবম চামড়ার একটা চৌকানো রুমাল।

পতু বললো, "আমার রুমালটা-যেটা বাঘে নিয়েছে—সেটার রংও ছিল এমনি"। বতুদি বললো "ঘটনাটা সত্যি? আমি তো ভেবেছি 'বানানো বললাম "আমরা কী বড় যে বানিয়ে বলবো। পতুতো অজ্ঞানও হয়ে যেতে পাবতো।"

মা কাকীমার কাছে এসে দাঁড়ালাম। বাবা কাকা খেতে বসেছে। বেশ কিছু মানুষ দঙ্গল বেধে চলে গেল ওপবের রাস্তায়—হাতে তাদের হ্যাজাক নয়তো জ্বলন্ত কাঠ। বনের পশুরা আগুনকে ভয় পায়।

শেঠ পরিবার রহনা হবেন। পাল্কি এল। রতুদির মা পাল্কিতে ঢুকেছেন। রতুদি ঢুকবে-হঠাৎ এক লাফে বাঘ এসে হাজির। রতুদি 'বাবাগো' বলে মাটিতে পড়ে গেল। রতুদির বাবা ছুট লাগালেন। বেহারারা পাল্কি ফেলে হাওয়া!

বাঘ দেখেই আমি আর পতু ছুটে এসেছি। বাঘ লাফিয়ে চলে গেল। মানুষের চীৎকারে—ভয়ে পালিয়েছে। আমাদের

তুবোনের সাহস দেখে সকলে অবাক। আসলে সাহস তো নয়-উত্তেজনায় চলে এসেছি।

সবাই তখন পতুকে জড়িয়ে ধরছে। আমায় জড়িয়ে ধরছে। কয়েকজন তখন রত্নাদির শুশ্রূষায় বসেছে। মিনিট ১৫.পর রত্নাদি ঠিক হল। বেহারাদের খুঁজে এনে যাত্রা শুরু করতে বেশ দেরী হল।

বাবার সঙ্গে আরো কিছু লোক লাঠি-বল্লম, মশাল, নিয়ে হাঁটতে থাকলো। পাল্কির মধ্যে রত্নাদিরা। হঠাৎ পথে দেখি, হলুদ মতন কী—গেলাম দেখি, রুমাল একটা—কাপড়েরই।

আমি পতুর কাছে গিয়ে বললাম, "পতু বাঘ তোর রুমাল ফেরৎ দিয়ে গেছে, এ্যাই নে।' পতু হাতে নিল, দেখলো, ছুটে গেল মশালের কাছে—দেখলো, ফিরে এসে বললো, 'চৈতু-ঠিক বলেছিস—আমারই রুমালটা, এ্যাই—দ্যাখ, সবুজ সুতোয় লেখা প্রতিমা।"

পাল্কির কাছে গেলাম ছুটে। পতু বললো, 'রতুদি বাঘ আমার রুমাল ফেলে দিয়ে গেছে।"

রতুদি বললো, "ঠিক আমারটার মতই—তোরটা পছন্দ হয়নি তাই আমারটা নিয়ে গেছে।" প্রশ্ন করলাম, 'সেকী' ? রতুদি হেসে বললো, "হরিণের চামড়ার রুমাল তো-সেটা বাঘেরই উপযুক্ত"। আমরা দুজন জবাব খুঁজে পেলাম না।

এরপর ঝর্ণাতলায়—নদীর ওপারে বাঘটাকে বহুবার দেখা গেছে—বাঘটা আর গ্রামে আসেনি। মানুষের অনিষ্টকারী নয় বলে কেউ ওকে মারতেও চেষ্টা করেনি। কিন্তু যখনই আমরা ওই বাঘটার কথা বলতাম—বলতাম, 'পতুর বাঘ'।

—০—

কাকের কেরামতি

প্রত্যেক শনিবার তো তোমার ছুটি থাকে—তাই না? তুমি তো দেখেছই—আমি কাককে আটার গুলি খাওয়াই—ছুঁড়ে দিই আকাশে—ছোট্ট ছোট্ট গুলি পাকিয়ে—ধাবগুলো ঠোঁট দিয়ে লুফে নেয়—আমার তিনটে কাক আছে জানো! তাদেরই খাওয়াই—ছোট কাকটা—বাচ্ছা—সোলকারের চাইতে ভাল ক্যাচ লোফে-তা জানো। বুড়োটা—ল্যাংড়া পারেনা—তাই তাকে দিই ছাদের মেঝেয়।

সেই যে একবার ডাকলুম তোমায়—তুমি এলে কাকেরা আর আসেনা—ওরা ভয় পায়। অথচ দ্যাখো, দাদার কাছে জুটো দোয়েল পাখি আসে। কী সুন্দর শিস দেয়! দাদা আমাকে তাদের কাছেই যেতে দেয় না। বলে, "তোর কাক নিয়ে তুই থাক।" খুব হিংসুটে আছে দাদাটা। পতুটা আসতে চায়—ওর মা আসতে দিতে চায় না—ওরা খুব লেখাপড়া নিয়ে কড়াকড়ি করে। আমার বাবা তা নয়—তুমি তো জানবেই—তোমারই তো ছোট ভাই। আমি যা করি তাতেই বাবার হাসি। কী প্রাণ খোলা হাসি হাসতে পারে বাবা! হাঁটে যখন তখন বাঘের মত। কী সাহস—জঙ্গলের পথে সবসময় একা একা যাতায়াত করে। তোমারও অবশ্য অনেক সাহসের গল্প শুনেছি। ওঃ বলছিলাম তো কাকের কথা।

মাতো প্রত্যেকদিন আটা খাওয়ানোর জন্যে বকে। বাবাকে বলে দেয় আর বাবা হাসে, বলে, 'বেটার আমার দয়ার শরীর।" বলি, দাদাও তো দোয়েল পাখিদের খেতে দেয়। মা বলে, "সে পোকা মাকড় ধরে রাখে, তাইই খাওয়ায়।" বলি 'কাকরা

তো পোকামাকড় খায় না।' মা বলে, "সব খায়, নোংরা পর্যন্ত খায় ওরা" আমি বলি "কাক কী ছাগল নাকি—যে সব খায়।' বাবা হাসে "হো হো"—মাও হেসে ফেলে, বলে, "পাগলী।"

মাঝে মাঝে মা হাসলেও বেশ রাগী কিন্তু। কেবলি বলে, "পড়্ পড়্ না পড়িস তো ঘরের কাজকর্ম শেখ—ধিঙ্গি মেয়ে হচ্ছিস—পরে শ্বাশুড়ীর হাতে মার খেয়ে মরবি"। বলি, "দশবছর তো বয়েস আমার—এখনি এসব বলো কেন? পড়িতো, কম পড়ি—তাতেই পাশ করে যাই—আমার যে জঙ্গল ভাল লাগে—ঝর্ণা ভাললাগে—পশু পাখি ভাল লাগে। মা 'ভালবাসাচ্ছি' বলে তেড়ে আসে—আমি? আমি দে দৌড়।

সেদিন এক কাণ্ড! সকাল থেকেই মায়ের চীৎকার। দাদা পর্যন্ত থামাতে পারছেনা। কী ব্যাপার প্রথমে বুঝছি না—মা বললো, 'ডাক্ হতভাগীকে—কাক পোষা হচ্ছে—নূতন ষ্টিলের চামচটা নিয়ে পালালো—ওই হতভাগীকেই পেটাবো—আটা'র গুলি খাওয়ানো বার করছি"—

শুয়ে শুয়েই বুঝছি-কাকে চামচটা নিয়ে পালিয়েছে—বেড়াতে গিয়ে তুমি যেটা কিনে এনেছিলে- নইলে এই জঙ্গুলে জায়গায় ষ্টিলের চামচ আসবে কোথা থেকে—অবশ্য চকচকে বলে কিনতেও পারে কেউ কেউ - যাকগে বুঝলাম, মায়ের হাতে আজ মার খেতেই হবে। বাবা বাড়ি নেই। দাদা বোঝাচ্ছে মাকে— "চৈতুর কী দোষ! ওর কাকই নিয়েছে—তা নাও হতে পারে।" মা শুনছেনা "এত বেলা হয়ে গেল—এখনও বিছানায় শুয়ে আছে—কুটোটী নাড়বে না—আজ ওরই একদিন কী আমারই একদিন" —দাদা তো আমায় ভালবাসে—বলছে "ঘুমন্ত মেয়েকে মেরো না।" মা কী শোনে,—এসেই—

চুলের মুঠি ধরে টান—আমি 'আঁক' করে উঠলুম—যেন এইমাত্র জাগছি ! মা দেখলো আমার মুখেব দিকে, ঠাণ্ডা গলায় বললো ''তোমার পেয়ারেব কাকরা আমাব ষ্টিলের চামচ নিয়ে উড়ে গেছে। খুঁজে আনো—নইলে খেতে পাবে না''। মাথাব চুল ছেড়ে দিল।

আমি বললাম ''আমার কাকরা দুষ্টু নয় চোর নয়—অন্য কোন কাক নিয়েছে।' মা বললো, 'তা জানি না। তুমি জানো, চামচটা তোমার জ্যাঠা এনেছেন—তাই ওটা পেতেই হবে—নইলে তিনি কী ভাববেন?' তুমি শুনে হাসছ? ওদিকে তখন তো মা ভযে লজ্জায় দিশাহারা। আমি বললাম, ঠিক আছে --আমার কাকেদের বলবো—তারা ঠিক খুঁজে এনে দেবে। মা বললো, 'হ্যাঁ কাকেরা তোর ভাষা বুঝবে—বেরো ধেড়ে, ধিঙ্গি কোথাকার' বিছানা থেকে ঠেলে নামিয়ে দিল মা।

সকালে কোথায় ভাবছিলাম যে ছুটির দিনটা কাটাবো ঝর্ণাতলায়—সেই শনিবার তুমি আসনি-তাই রবিবার বেলা করেই উঠবো ভেবেছিলাম—বাবা তো যাবে হাটে ভোরবেলাতেই—কিন্তু কী গেবো—সকালেই মায়ের হাতে মাব—মানে চুলটানা—মনটা যাকে বলে বিষন্ন হয়ে গেল। ধীবপায়ে বেড়িয়ে পড়লাম বাড়ির বাইরে।

দাদা ছুটে এসে গেল কাছে—"কোথায় যাচ্ছিস?" বলি, 'চামচে খুঁঝতে।' দাদা বললো, ''যেতে হবেনা—আমি খুঁজেছি কাছাকাছি কোথাও নেই। অন্য কোন কাক নিয়েছে বোধ হয়।'' বললাম, 'সে তো নিশ্চয়ই—যাই ল্যাংড়াকে বলি--ওরা ঠিক খুঁজে দেবে।' দাদা হেসে বললো, "কাকরা কী মানুষ যে তো'ব ভাষা বুঝবে।" আমার মন খারাপ হয়ে গেল—''তবে যে

কাকেদের সঙ্গে কথা বলি—ওরা ঠিক সাড়া দেয়—'বাচ্ছা' বলে ডাকলে ছোটটাই আসে 'ল্যাংড়া' বললে খোঁড়াটাই আসে, 'দীর্ঘা' বলে ডাকলে মা কাকটাই এসে ঘাড়ে বসে।'

দাদা বললো, "ডাকটা বোঝে নিশ্চয়ই—আর কিছু বোঝেনা।" বলি, 'তাহলে কী হবে দাদা! মা তো ভীষণ রেগে আছে!' দাদা বললো, "জ্যেঠু এলে বলবি—আবার এনে দেবে।" দাদার কথায় সাহস পেলাম না—জানি, তুমি এনে দেবে-কিন্তু সে তো দুদিন বাদে—ততদিনে মা আমার হাড় আস্ত রাখবে না।

বাড়ি ফিরে এলাম। মা কথাই বলছে না। মুখ ভারী করে বসে আছে। বাবা বাড়িতে নেই—আমারও মন খারাপ। তুমিই বলো, মায়ের মুখে হাসি নেই—দেখতে ভাল লাগে? আমিও হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে পড়লাম। চোখে জল এসে গেল কোথা থেকে? হঠাৎ মনে পড়লো, গতকাল দুটো বাইরের কাক এসেছিল—দিইনি তাদের—ল্যাংড়া আর দীর্ঘা তাদের তাড়া করেছিল। আবার মনে পড়লো, আজও তো দিইনি আটার গুলি—গেল কোথায় ওরা—তাছাড়া মা তো আজ আর আটা দেবেই না।

"মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিন মহারানী"—মায়ের মনে খুব রাগ না হলে-মা আমায় মহারানী বলে না। বললাম 'চামচে খুঁজে এনে তবে খাবো।' মা বললো, "এত তেজ বলেই তো মহারানী বলি—ওইখানে তোমার পেয়ারের বাবুদের জন্য আটার গুলি রাখা আছে।" বলে মা উঠে গেল।

আমি তড়াক করে লাফিয়ে নামলাম দাওয়া থেকে। এক ছুটে বাইরে—ছুট, ছুট—ঝর্ণাতলায় চলে এসেছি। ছায়ায় ঢাকা একটা বড় পাথরের চাতালে শুয়ে ঝর্ণার জলের নীচের পাথর

গুলো দেখছি। ভুলে গেছি খাইনি। ভুলে গেছি মায়ের রাগ, ভুলেছি হারানো চামচের কথা। বেশ একটা তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব।

এমন সময় কানের কাছে 'ক' করে আওয়াজ। চমকে তাকিয়ে দেখি বাচ্ছা আমি হেসে ডাকলাম, "বাচ্ছা আয়— এখানে কেনো?" বাছা নেমে এল বুকের কাছে। তোর মা কোথায় বাবা?'' বাচ্ছা 'ক' বলে ডাকলো—সামান্য উড়েই আবার কাছে এল। উঠলাম—ওকে অনুসরণ করতে থাকলাম। দেখি, ল্যাংড়া কাৎ হয়ে শুয়ে —দীর্ঘা তাকে ঠোঁটে করে জল খাওয়াচ্ছে—

তাড়াতাড়ি জামা ভিজিয়ে জল আনলাম খানিকটা—দিলাম ল্যাংড়ার গায়ে, মাথায়, মুখে-কোলে নিয়ে বসলাম দীর্ঘা আমার ঘাড়ে। ল্যাংড়া খানিকটা পরে ডাক দিল, 'ক'—এক পায়ে দাঁড়াল—ডানা ঝাপটাল—ডাকলো—'কঃ'—দীর্ঘা উড়ে গেল—সামান্য পরেই ঠোঁটে করে এনে দিল চামচটা।

খুব কষ্ট হল। বুঝলাম, এই চামচ কাড়তে গিয়েই ল্যাংড়ারা আটা খেতে আসেনি—ল্যাংড়ার প্রাণ সংশয় হয়েছিল। দুষ্টু কাকেরা ওকে বেশ ঘায়েল করেছে। ল্যাংড়াকে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরছি—

পতু আর দাদা আসছে হনহন করে। দাদা বললে, "কীরে?" আমি বাঁ হাতের চামচটা দেখালাম। পতু কাছে এসে চামচটা নিল। বললো, "কি করে পেলি?"

বললাম, "ল্যাংড়ার জন্য পেয়েছি। ওর শরীর খুব খারাপ জোর ঠোকর খেয়েছে-তারাতাড়ি চল ওকে খাওয়াতে হবে।"

দাদা বললো, "তুই অবাক করে দিলি চৈতু।"

বললাম, 'অবাক তো করেছে কাকেরা। আমি তো কেবল

রাগ করে এখানে এসে শুয়েছিলাম। বাচ্চা এসে ডেকে নিয়ে গেল।' বলে সবটা বললাম।

দাদার সঙ্গে ঘরে ফিরলাম। পতু গেল কাকদের আটা খাওয়াতে। চামচে ফিরে পেয়ে মায়ের মুখে হাসি আর কান্না আমায় কতগুলো চুমো খেল।

হাট থেকে ফিরে সব শুনে বাবার কী হাসি। বললো, "খুব সত্যি কথা হল একটাই—মায়ের মুখে হাসি না থাকলে ভাল লাগে না।"

দাদা বললো, "সব পশু পাখিই ভালবাসতে জানে।" বাবা বললো, "এক মহিলা সিংহ পোষেন আফ্রিকার জঙ্গলেই থাকেন। ভালবাসা সবাই বুঝতে পারে—চৈতুই কেবল বুঝতে চায় না—তার মা তাকে কত ভালবাসে।"

"সে তো আমি জানি" বলে মায়ের বুকে মুখ লুকালাম। মা আমার মাথায় চুমু খেল।

কাজল

পূজায় কদিন ছুটি পেয়ে গেলাম। অন্য বছর এত দিন ছুটি থাকে না। তাই ঠিক করলাম কিছু একটা করতে হবে। কী যে করি—কটা ছবি আঁকলাম—চাই নীজ ইংক দিয়ে। সাকুল্যে রং আছে তিনটী—কালো বাদে সাদা আর লাল। বুড়ো বয়সে ছবি আঁকছি—শিখছি আরকি!

সপ্তমীর সকালে ছাদে বেরিয়ে মনটা কেমন যেন রোমাঞ্চিত

হল —কী সুন্দর সকাল। সপ্তাহের ছটা দিন থাকি কর্মব্যস্ত শহরের অপরিচ্ছিন্ন পরিবেশে—কখনও আবার শনিবারেও ছুটি পাই না—ভাইপো ভাইঝিরা কষ্ট পায়। সপ্তাহে আমায় একদিন মাত্র পায় সেদিন ওরা বেশ খুশিতে থাকে—বাবা মায়ের শাসনটা একটু কম থাকে।

ভাইপো এখন একটু বড় হয়েছে—অত তার গায়ে পড়ে না। কিন্তু চৈতু! শনিবার বিকেলে ওর সাথে যেতেই হয় ওর প্রিয় ঝর্ণা তলায়। ওরা দুই বন্ধু পথ চলে বকতে বকতে কত কি দেখাতে দেখাতে। এমন ভালবাসে এখানকার প্রতিটি জিনিসকে কি বলবো। ওদের সঙ্গে গিয়ে একবার ঝর্ণার ওপারে "পতুর বাঘ' কে দেখেছিও আমি ভয় পেয়েছি, ওরা পায়নি বলেছে, "ও মানুশ ম'রে না।"

ভাইপো যখন ছোট ছিল—তখন সে ভালবাসতো স্কুল মাঠ। দূরের নীল পাহাড় শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে বসে থাকতো। শীতকালে তাদেয় থাকতো বরফের মুকুট। ভাইপোর খুব ইচ্ছে ছিল সে যাবে দূরের পাহাড়ে—পাহাড়ের চূড়ো থেকে দেখবে সেখান থেকে কেমন দেখায় আমাদের গ্রামকে। বড় হয়ে সে এখন ভাল ছাত্র হয়েছে—দৌড়েও প্রাইজ পেয়েছে জেলাস্তরে।

ছাদে ডাঁই করা কাঠের টুকরো। শীত প্রায় এসে গেল। আগুন জ্বালার প্রস্তুতি নিচ্ছে ভাই। কাঠের টুকরোগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। হঠাৎ একটা কাঠ পেলাম প্রায় মানুষ মানুষ দেখতে! সেটাকে নিয়ে বসলাম কিছুক্ষণ—তারপর নখ কাটার নরুন দিয়ে সামান্য কাটাকুটি করতেই হয়ে গেল এক কিশোরী মেয়ে। নিয়ে এসে তুলি দিয়ে মাথার চুল করলাম ঘনকালো পরিয়ে দিলাম লাল শাদা ডুরে শাড়ি। বেশ সুন্দর লাগছে। হঠাৎ খেয়াল হলো, পুতুল মেয়েটার দুটো হাতই নেই। হায়

আগে খেয়াল হলো না? কি করি. রাখি না ফেলে দিই। ভাবছি

চৈতু এসে হাজির। ওঃ কি সুন্দর পুতুল! জ্যেঠু, আমায় দাও, কোথায় পেলে? ওঃ তুমি নিজেই বানিয়েছ। বললাম, ' চৈতু এটা ফেলে দিই এর হাত নেই—কাঠটা সরু থাকায় হাত করা যায়নি"—"চৈতু ঝাঁপিয়ে পড়লো—' ঈশ্ ফেলে দেবে কেন? ওর লাগবে না বুঝি —নাই না থাকল ওর হাত '—হাতে নিল. বললো, "এর ন ম দিলাম কাজল, কি সুন্দর চোখ—ওর হাত নেই বলে ওর চোখে মুখেও কষ্ট ফুটে উঠেছে! কাজল কাঁদে না। জ্যেঠু ওবকম ব'লে—কিছু খুব ভাল লোক।" পুতুলটা নিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই এল। ছোট একটা কাঠের শিশু পুতুলও এনেছে। তাবও লাল সাদা পোষাক। চোখ দুটো বড় বড়—মুখে দুষ্টুমিব হাসি। বললো, "মেলাতলায় কিনেছিলাম। এর নাম পিণ্টু দিদি হারিয়ে গেছে। কাজল আজ থেকে তার দিদি হলো।"

দুভাই বোনকে শুইয়ে দিল খেলার বালিশ মাথায় দিয়ে। তারপব তার দেখা মিললো সেই দুপুব গড়িয়ে বিকেল।

গল্পেব বই পড়ছিলাম। চৈতু আর পতু এলো। পতুকে দেখাল। ' ওই দ্যাখ কাজল আর পিণ্টু শুয়ে আছে। আমার ওপর ওদের রাগ হয়ে গেছে, হবেই তো?" পতু কাজলকে দেখলো, বললো, "এমা হাত নেই!" চৈতু বললো, ' তাতে কি, এই তো গত বছর তুই আব আমি মেলা তলায় দেখলাম না একটা হাত না থাকা মেয়ে পা দিয়ে কত কি করছিল।"

পতু বললো "হ্যাঁ তো- পা দিয়ে লিখছিল—কাচি দিয়ে কাপড় 'কাটছিল।" চৈতু বললো, "জ্যেঠু বানিয়েছে—হাত নেই বলে ফেলে দিচ্ছিল—আমি নিয়েছি।"

পতু কাছে এসে বললো, "জ্যেঠু আমাকেও একটা বানিয়ে দিও।" চৈতু বললো, "তোরা তো বাবা বড়লোক—পয়সা দিয়ে কিনে নিস।' পতু বললো "জ্যেঠুর নিজের হাতের তৈরী জিনিস কি মেলায় পাওয়া যাবে।" চৈতু বললো, "সে কত ভাল দেখতে।" পতু বললো, "কত তো কেনাপুতুল আছে আমার— কিন্তু কাজলের মত এমন সুন্দর চোখ নেই কারো।"

চৈতু কাজলকে তুলে বিল হাতে চুমু খেল বললো "পতু নজর দিসনে।" পতু হাসলে "বা, আমি তো ওর মাসি প্রশংসা করলে কি আছে?"

"নারে পতু কিছু মনে করিস না—আসলে জ্যেঠু ফেলে দিতে চেয়েছিল বলেই আমার সকলের ওপর সন্দেহ।" আমি হাসলাম—

চৈতু ছুটে এল আমার কাছে। "হাসছে কেনো? জানো, ওই যে স্কুল পাড়ায় ঠিক আমার কাজলের মতো একটা মেয়ে থাকে—করবীদি—সে তো জ্যান্ত মানুষই—তাব বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান,—তারও তো হাত নেই জন্ম থেকেই।"

পতু কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, "হ্যাঁ জ্যেঠু- চৈতু যা বলেছে তা সত্যিই করবীদি কে তার বাবা মা বাইরে বেরতে দেয় না। কিন্তু করবীদি না খুব ভাল লেখাপড়া জানে। আমরা দু বন্ধু মাঝে মাঝে যাই --আজই তো দুপুরে গেসলাম।"

চৈতু বললো, "হ্যাঁ, একদিন আমি করবীদিকে মেলায় দেখা মেয়েটার কথ বলেছিলাম। করবীদি বললো, পা দিয়ে তো আমিও লিখি, পাতা ওল্টাই, অনেক কিছুই করি।' ওর মনে খুব জোর আছে।"

ঝর্ণাতলায় বেড়াতে গিয়ে কাজল পিন্টুর কথা আর মনে নেই।

ঝর্ণার জলের তলায় আছে হীরে মানিক চুণী পান্না। ঝর্ণার জলে তাই এত ঝিকিমিকি, তাই না জ্যেঠু ! ওই খানটায় বররা এসেছিল জল খেতে, এই গাছটার তলায় ল্যাংড়া পড়েছিল এই পাথরটায় আমি শুয়ে থাকি ইত্যাদি।

শুনতে শুনতে কখনো আমি হাসি, কখনো মাথা নাড়ি।

পতু গাছ ভালবাসে। কত গাছ এখানে তাদের ডালপাতার সংখ্যাও মনে হয় পতু জানে। কোন গাছের ডাল কি করে ভেঙেছে কোন গাছগুলোর পাতা ধরার দিন এগিয়ে এসেছে, কার ফল হবে, কার ফুল ফুটবে—সব খোঁজ রাখে পতু। ভাবি, এই প্রকৃতি প্রেমিকা দুলালী দুটির বড় হলে কি হবে? ওরা তো ছেলে নয় যে এখানেই থাকবে। যাক, ধীরে ধীরে বড় হবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন সকালে উঠেই ছুটে এসে হাজির হলো। মুখে কেমন যেন উদ্বিগ্ন ভাব। প্রশ্ন করলাম; কি হল মামনি?"

চৈতু বললো "জানো কাল রাতে দেখি, কাজল পিন্টুকে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করছে গান গেয়ে গেয়ে।" বললাম, "ওই তো আমার বিছানায় শুয়ে আছে তোমার কাজল আর পিন্টু! তুমিই তো শুইয়ে দিয়ে গেছ। স্বপ্ন দেখেছ চৈতুমা।"

চৈতু ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটো পুতুলকেই কোলে তুলে নিল। দোলানো খানিকক্ষণ—তারপর পিন্টুকে বিছানায় রেখে কাজলকে মুখের কাছে তুলে বললো—

"কাজল তুমি রেগে গেছ তাই বাজে স্বপ্ন দেখালে। ও সব করা চলবে না গানটা মনে নেই—কিছু সুন্দর হয়েছিল।"

অনেকক্ষণ ওদের নিয়েই কাটাল। ওর মা চেঁচাতে তবে নামলো তলায়।

আমি বই নিয়ে বসেছি। কাকেদের আটার গুলি খাওয়াচ্ছে— আর গল্প বলছে—কাজলকে আর পিন্টুকে রেখেছে ছাদে—কাক তিনটেই রয়েছে তাদের পাশে। কী প্রচণ্ড সারল্য। এখনও বিশ্বাস করে—কাকেরা তার কথা বুঝতে পারে। বাচ্ছা কাকটা একটু আলতো করে পিন্টুর গায়েতে ঠোঁট ঠেকা'ল। চৈতু "সর্বনাশ করবি বাচ্ছা—পিন্টুরচোখটা যেত এক্ষুনি—সরে বোস্।" বলতে বাচ্ছা সত্যই সামান্য সরে বসলো। চৈতু বললো, "এদের ঠোকরাবি না—আঁচড়াবি না—এরা তোদের বন্ধু কেমন? কাজলকে একদম কষ্ট দিবিনা—দেখছিস তো ওর হাত দুটোই নেই! বেচারীর কত কষ্ট!"

মনে মনে ভাবি- একটা পুতুলের দুঃখেই অধীর এই ছোট্ট মেয়েটা জানেইনা পৃথিবীতে কত প্রতিবন্ধী আছে। তাদেরও কত কষ্ট!

— ✪ —

মিষ্টি নিয়ে ছোট্ট হাসি

জানো সেজ, একটা গল্প লিখেছি—স্কুল ম্যাগাজিনে দেব। দিদিমণি বলেছেন, "ভালো হলে ছাপিয়ে দেব।" তুমি একটু দেখে দাও না।—

সে দিন ফিফথ্ পিরিয়ডে হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। মুস্কিলে পড়ে গেলাম। রিক্সা করে আসি যাই—রিক্সা তো আসবে সেই বিকাল চারটেয়। এতটা সময় বসে থাকবো? এক পাড়ায় থাকি আমি, পতু, বন্দনা আর সুধা। চারজনেই পায়ে হেঁটে ফিরবো মনস্থ করলাম। আগেকার প্রাথমিক বিদ্যালয়টা ছিল কাছেই—

এক দৌড়ে চলে আসতাম। এখন ফাইভে পড়ি —অনেক ইংরাজী শব্দ শিখেছি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টা এক কিলোমিটার দূর। জায়গাটায় একটু শহুরে ভাব এসে গেছে।

আমার এত তাড়াতাড়ি আসা হতো না। সুধা সমস্যা তৈরী করে ফেলেছিল। ছুটি ঘোষনার সময় দিদিমণি বললেন—"বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভা হবে—যারা আবৃত্তি, গান, নাচ বা নাটকে অংশ নিতে চাও—তারা থেকে যাও। সুধা বলে দিল" —"চৈতালী নাটক করবে দিদিমণি। ও পাড়ায় দাদাদের সঙ্গে নাটক করেছে।" দিদিমণি বললেন, "তাহলে চৈতালী থাকো।"

বললাম, "দিদিমনি নাটক করেছিলাম বটে—তাতে মজাও হয়েছিল আমাকে নিয়ে—দাদা বুদ্ধি করে সামলে না নিলে নাটকটাই ভণ্ডুল হয়ে যেত।"

সবাই উদগ্রীব—এক পতু ছাড়া। দিদিমনি বললেন, "বলো শুনি।"

বললাম "সুধা আমায় বিপদে ফেলবে বলেই এটা বলেছে। তবে আমি ভয় পাই না বলতে—নাটকে আমার রোল ছিল একটা পড়া না পারা লাষ্ট বেঞ্চের ছেলের—মাষ্টার মশায়ের রোল করছে দাদা —সে আমার কান মূলবে এতে লজ্জার কি আছে—তারপর শেষ বেঞ্চে বসে ঢুলতে ঢুলতে পড়ে যাব—সব ঠিক করেছি। কিন্তু পড়ে আর উঠতে পারছি না! পাড়ার তক্তাপোষ, বেঞ্চি যোগাড় করে ষ্টেজ হয়েছিল—তার ফাঁক দিয়ে আমি একেবারে তলায় পড়ে গেছি— উঠতেই পারছি না —পা কেটে গেছে দাদা এসে তুললো—মাষ্টার মশাইরূপী দাদা রক্ত দেখেই ডায়োলোগ পাল্টে সব ম্যানেজ করে দিল। দাদার ক্ষমতায় আমি অবাক—কেউ বুঝতেও পারেনি সবাই ভেবেছিল নাটকে

বোধহয় এমনই আছে। সুধাও ভেবেছিল ওটা-রক্ত নয় আলতা।"

দিদিমনি হাসলেন, বললেন, "তাহলে করবে তো ?" বলি, "না—করবো না-দিদিমনি ! মায়ের মত পাবো না"

কোনদিন হেঁটে ফিরিনি। তোমরা তো তখন হেঁটেই এতদূর আসতে পথের ধারে তখনও বেশ জঙ্গল ছিল। এখন এখানে প্রচুর বাড়ি হয়ে গেছে। পথে সবসময় লোক চলাচল করছে—গ্রামের পথে পৌঁছালে আর ভয় নেই।

চারটে মেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশে তাকিয়ে দেখি, মেঘ করেছে—পা চালালাম দ্রুত।

একটা মিষ্টির দোকানের কাছে আসতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো। কারোর কাছেই ছাতি নেই। নেবোই বা কেন রিক্সায় আসি যাই। দোকানের শেডে ঢুকে পড়লাম। ছাঁট আসছে। দোকানের ভেতরে তাকিয়ে দেখি, চেয়ার টেবিল খালি। দোকানদার আদুর গায়ে ক্যাশ বাক্সের কাছে বসে। একটা ছেলে দোকানে কাজ করে—সে যেন বড় মাপের কালো ফুটবল।

পতু কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, "ঠিক যেন কালজাম," হাসি চাপলাম। দোকানদারকে বললাম, "ভিজে যাচ্ছি—ভেতরে আসবো ?"

দোকানদার বললেন "এসো মা লক্ষ্মীরা"। আমরা একটা টেবিলের পাশে চারটে চেয়ারে বসলাম। পালিশহীন ফ্যাকাশে বিবর্ণ চেয়ার।

কালোজাম এসে প্রশ্ন করলো, "কি খাবেন ?" বলি, "পয়সা নেই দাদা।" বসে বসে দেখি, মিষ্টিগুলো কেমন যেন বিবর্ণ শোকেসের কাচটাও অপরিস্কার। গল্প করতে থাকলাম আবোল তাবোল। বৃষ্টির তোড় কমেছে—থামেনি।

ছাতা মাথায় একজন ভদ্রলোক দোকানে ঢুকলেন। সোকেশের সামনে দাঁড়ালেন। কালোজাম গামছা কাঁধে প্রশ্ন করলো, "কি দেব।" ভদ্রলোক সোকেশের ওপর দিয়ে হাত দেখিয়ে বললেন, "এই নীল সবুজ লাল রংয়ের খাবারটা কী সন্দেশ?" কালোজাম ঘাড় কাৎ করে বললো, "হাঁ" "কত দাম?" "একটাকা।" "দিন তো ওটা।"

কথাবার্তা শুনে কৌতূহল হল, নীল লাল রংয়ের সন্দেশ দেখার লোভ হল কালোজাম ডিশে সন্দেশ বাব করলো— কী সুন্দর রং—আমরা অবাক। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে নিতে যেতেই ভনভন করে কয়েকটা মাছি উড়ে গেল— সন্দেশটা সাদা হয়ে গেল।

"য়্যাঁ" করে ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। 'মাছি—উরি বাবা" বলেই ভদ্রলোক ছাতা না খুলেই পালালেন।

আমরাও হাসতে হাসতে পালালাম।

— o —

ঝুলন

আজ ঝুলনের ছুটি। আমাদেব গ্রামে ঘরে ঘবে শ্রীকৃষ্ণেব পুজা হয়। আমার মাও করে। বাবা আর দাদাও মাকে সাহায্য করে। আমি? আমাব সময় কোথায়?

আমি কাজলকে আর পিন্টুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তাছাড়া কাক তিনটে আছে না! কাজলকে নিয়েই ভাবনা বেশি—বেচারীর তো দুটো হাতই নেই।

তবে ওর বিয়ে হতে বাধা নেই। সেদিন পতু বললো, "জানিস চৈতু, করবীদির বিয়ে হয়ে গেছে।" আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে বললো, হ্যাঁরে— সেদিন আমি

দেখেছি—করবীদির সিঁথিতে সিদুর! ওর পাশেই ওর বর। জ্যেঠুও ছিল। জ্যেঠু ডাকলো, গেলাম। জ্যেঠু বললো, "দ্যাখো পতু, তোমার কাবেরীদির বরকে। দেখলাম, বেশ সুন্দর, চোখ, কান, নাক, হাত, পা সবই আছে। ববটা না হাসছিল। বললো, কি দেখছ? আমি চেপে গেলাম! তিনজনকেই নমস্কার করে চলে এলাম।" কাজলকে আর পিন্টুকে সেই বিয়ের কথা বলে, অনেক বুঝিয়ে শুইয়ে রেখে কাক তিনটেকে আটার গুলি খাওয়ালাম। ল্যাংড়া আম গাছের ডালে বসে রইল—বাচ্ছা আর দীর্ঘা গেল আবো খাবারের খোঁজে—অতটুকু খাবারে তো ওদের পেট ভরে না।

চুপি চুপি পা চেপে ঘর থেকে বেরিয়েই দৌড়। মায়েব গলা শুনতে পেলাম, "পলু ওই ছাখ চৈতুটা পালালো"—বাবা বললো, "থাকনা—আজতো ছুটির দিন!"

আর ভয় নেই—আস্তে চলছি। শুনতে পেলাম, দাদা বলছে-"যাবে আর কোথায়-হয় পতুদের বাড়ি নয়তো সেই ঝর্ণাতলায়"

মনে মনে রাগ হলো, চললাম আমাদের বাগানের দিকে।

এদিকে কয়েকমাস আসিনি। অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছি—হঠাৎ দেখি, বনের মধ্যে ছোট্ট একটা কুটির—তার পিছনে ছুটো কলাগাছ—আর সামনে খাটিয়ায় বসে আছে এক বুড়ো—হুকো হাতে—হাওয়ায় তার সাদা ফুরফুরে দাড়ি উড়ছে। থমকে দাঁড়িযে ভাবতে থাকলাম, এরা এল কোত্থেকে?

চেনা জায়গাটাকে বিষম অচেনা লাগছে।

হাওয়া জোরে বইছে। থমকে দাঁড়িয়েই আছি। হঠাৎ দেখি একটা বাঘ। হলুদ কালো ডোরাদার বাঘ—বেশ হৃষ্টপুষ্ট। বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে—চীৎকার করে বুড়োকে

সাবধান করবো —গলায় বোবা ধরেছে—পায়ে খিল—কিচ্ছুটি করতে পারছিনা—

বাঘটা খাটিয়ার তলায় ঢুকে গেল। বুড়োটা নির্বিকার বসে আছে—হাতের হুকোটাও নিষ্কম্প।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এল পতু। "কী রে চৈতু—কী দেখছিস হাঁ করে—" বললাম, 'চুপ-বাঘ।' পতু বুঁকড়ে গেল, "—কোথায়?" আমি হাত বাড়িয়ে খাটিয়ার নীচে দেখালাম। পতু "হি হি" করে হাসলো বললো, "ছবির বাঘ—ওটা খুজতেই তো নামলাম ছাদ থেকে। দ্যাখনা—হাওয়ায় উড়ে এল।"

তখন সম্বিৎ ফিরে পেলাম বুঝলাম, ওগুলো সব ঝুলনের পুতুল।

পতু বললো, "পলুদা কী সুন্দর করে সাজিয়েছে।—ওই দ্যাখ ওখানে ঝুলছে রাধাকৃষ্ণ।" পতু প্রণাম করলো। আমিও মনের মধ্যে একরাশ লজ্জা নিয়ে প্রণাম করলাম।

মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। বললো, "পলু ছাখ, চৈতু কী ভক্তিমতী হয়েছে—বাসিমুখে কৃষ্ণ প্রণাম জানাচ্ছে।" আমি এসে মাকেও পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

দাদা হেসে বললো, "কৃষ্ণের মত বর হয় যেন ওর।" পতু হাসলো, 'হি হি'। আমি বললাম, 'না—এমা—ওর কতগুলো বৌ'।

— ★ —

রোজ পিসি

এক শনিবারের সন্ধ্যায় ভাইপো ভাইঝির পড়াশুনার শেষে গল্প করছিলাম। নানান কথার শেষে টাকাকড়ির কথা উঠলো।

সেখান থেকে গল্প চলে গেল নিজের প্রসংগ।

জানালাম, বর্তমানে একজনের কাছেই ঋনী রয়ে গেছি—অবশ্যই আর্থিক দিক দিয়ে—নইলে পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, গুরুঋণ তো অপরিশোধ্য।

চৈতু প্রশ্ন করলো, "কার কাছে তোমার ধার আছে? কতটাকা?" বললাম, 'আমার এক মেয়ে বন্ধুর কাছে—দশটাকা।' চৈতু বললো, 'মাত্র দশ—সে তো এখন তোমার কাছে কিছুই নয়—দিয়ে দাওনি কেনো।'

বললাম, সেই তো মুস্কিল মা—সে যে কোথায় কে জানে! যখন টাকাটা নিই তখন সে থাকতো এইখানে—সে তখন ছিল কুমারী—তার কিছুদিন পরেই তার বিয়ে হয়ে যায়, কোথায় বিয়ে হয় তার খোঁজ রাখিনি—কেননা, তখন তো টাকা ফেরৎ দেবার ব্যাপারটা মাথায় ছিলনা।

পলু বললো, "ওর বাড়িতে গিয়ে ওর বাবা মাকে প্রশ্ন করলেই পারো।" ভাইপোর বুদ্ধিতে খুশি হলাম। বললাম, তা পাবতাম—কিন্তু টাকা ফেরতের কথাটা যখন মনে পড়লো তখন সেই মেয়েটার মা মারা গেছেন—আর বাবা চলে গেছে অন্য জায়গায়। ফলে মেয়েটা গরঠিকানা হয়ে গেল—আর আমি ঋণীই হয়ে গেলাম।

চৈতু প্রশ্ন করলো, "পিসিটার নাম কী ছিল? টাকাটা কেন নিয়েছিলে?" বললাম, তার নাম ছিল রোজ—ডাক্তার বাবুর মেয়ে—দেখতে শুনতে ভাল হলেও সে ছিল খুব মোটা বিশেষ বন্ধু ছিলনা তার—কিন্তু মনটা ছিল খুব নরম—আমি তো খুব বেঁটে ছিলাম—বন্ধুরা যখন তখন চড় চাপটা দিত—রাগাতো—তাই হয়তো রোজ আমায় স্নেহ করতো।

তারপর বড় হলাম। চাকরীতে ঢুকলাম। তোমাদের ঠার্কুদা মারা গেল। ষ্ট্রোক হয়ে গেসল—হাতে তখন পাঁচটা টাকাও ছিলনা যে ডাক্তার ডাকি। গেলাম রোজের কাছে—তার বাবাই তো একমাত্র ডাক্তার। রোজ তার বাবাকে বলে দিল ফী না নিতে আর দিল দশটাকা। বললো, "আর নেই।" বললাম "রোজ এটাকা আমি ফেরৎ দেবো।" সে হেসে বলেছিল, 'পারলে দিস।'

বাবা বাঁচলোনা। তোমার বাবা আর পিসি তখন ছোট। কত জায়গায় কত টাকা ধার হয়ে গেল। তারপর সব শোধ করেছি। তোমার ঠাকুমা মারা গেল—ওঃ সে তো তোমরা দেখেছো।

চৈতু বললো, 'পিসি যখন ধার দিয়েছিল তখন টাকার দাম ছিল বেশী।" পলু বললো, 'এখন তো কত টাকাই তুমি দান করো। রোজ পিসির নামে কিছু টাকা দান করে দিও।"

বললাম, দিয়েছি—তবু শান্তি পাচ্ছি না। কেননা তাকে তো বলেছিলাম ফেরৎ দেবো। এখন মানতেই হচ্ছে দান বলে—বন্ধুর দান।

সেই গল্প বলার মাস তিনেক পরে আবার এক শনিবারের সন্ধ্যায় চৈতু হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে বললো, "জ্যেঠু পেয়েছি।" প্রশ্ন করলোম, 'কি পেয়েছিস?' হেসে বললো, "রোজ পিসিকে।" চমকে বললাম, 'কি পিসিকে? "সেই পিসিকে—যার কাছে তুমি টাকা ধারো।"

লাফিয়ে উঠলাম, কোথায়? চৈতু ছেড়ে দিয়ে বললো, "বসোতো—এই গ্রামেই আছেন, থাকবেন কদিন।" বসলাম, প্রশ্ন করলাম, কেমন করে জানলি যে সেইই রোজ পিসি?

চৈতু বললো, "চুপ করে বসে শোনো জ্যেঠু—তোমরা তো

কেবলি ভাবো এই চৈতুটা একটা বোকা—ভাল করে পড়ে না জানোই না যে আমিও চালাক আছি—

"একদিন সেদিন বুধবার, হ্যাঁ চারদিন আগেই—বিকালে গেছি ঝর্ণা তলায়—আমি আর পতু। একটা বড় পাথরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছি। পতুও। হঠাৎ কথা শুনতে পেলাম। মুখটা সামান্য তুলে তাকালাম কৌতূহলে—আমাদের মতো গ্রাম্য ভাষা বলছে না—দেখলাম—তিনজন—দুটি মহিলা একটি পুরুষ। এই হয়েছে মুস্কিল—গ্রামে নতুন কেউ এলেই এই ঝর্ণাটা দেখতে আসে—ভাবছি—তখন সেই পুরুষটী বললো, 'মা কোথায় চলেছ বলোতো? রাস্তা ভুল করনি তো?'

বয়স্কা মহিলা বললেন, "কি যে বলিস জন, ছোট্ট বেলাটা কেটেছেতো এই গ্রামেই।" তরুণী মেয়েটী বললেন, "তোমার বাবার ডাক্তার খানাটা কোথায় ছিল তাইতো বলতে পারছ না?" বৃদ্ধা বললেন, "বাড়ি ঘর ভেঙে যায়।" জন নামের যুবকটী বললেন, 'ঝর্ণাও তো শুকিয়ে যায় মা।"

আমি আর চুপ থকতে পারলামনা, বললাম 'শুকায়নিতো-এই তো কাছেই বয়ে যাচ্ছে পাথরের আড়ালে।' ওরা চমকিয়ে তাকালেন আমাদের দিকে। বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন. "ওখানে কী করছিস মা।" পতু বললো. "শুয়ে শুয়ে ঝর্ণা দেখছি এইসব গাছ পালা দেখছি আমরা।" বললাম, আমরা তো রোজ আসি।

বৃদ্ধা বললেন, 'তোমাদের মতো বয়সে আমিও রোজ আসতাম-তবে পাথরে তো উঠতে পারতাম না তখন আমি খুব মোটা ছিলাম।" হাসলেন।

তরুণী মেয়েটী বললো "মা, এই খানে নাকি একটা বাঘ

জল খেতে আসে—তার নাম নাকি পতুর বাঘ। মানুষকে নাকি সে কিছু বলে না।"

বললাম, "এই তো সেই পতু—এরই হাত থেকে রুমাল নিয়ে আবার ফেরৎ দিয়েছিল বাঘটা" ওরা বসলেন নীচের পাথরে—আমরা নামলাম- বসলাম তাদের কাছে।

নানা গল্পে জানা গেল—ওঁরা এসেছেন বৃদ্ধা জননীর স্বাস্থ্য উদ্ধারে। আছেন রতনলাল শেঠের গেষ্ট হাউসে। কন্যাটীর নাম মেরী—তিনি এখনও পড়াশুনা করেন। যুবকটি, যাঁর নাম জন চাকরী করেন।

বেশ ইংরাজ ঘেঁষা নামগুলো। তাই হঠাৎ মাথায় প্রশ্ন জাগলো, প্রশ্ন করলাম, আপনি কী তবে রোজ পিসি?

উনি চমকে তাকালেন-বললেন "কী করে জানলে?" তখন তোমার কথা বললাম। প্রথমে অনেকটা সময় নিলেন—চিনতে পারলেন না—তখন বললাম "সেই যে বেঁটে।" "তখন হাসলেন, বললেন," ত্রিশ বছর আগেকার কথা তো—এখন কেমন আছে সে? কী করছে? তোমার জ্যাঠার ছেলে মেয়ে কটী? তারা কোথায় আছে?

বললাম তোমার কথা। বিয়ে করনি শুনে কেমন যেন থমকে গেলেন। দাদা দিদি তো আমাদের সঙ্গে তখুনি আসতে চাইছিল-কিন্তু পিসিমা আসতে দিল না-বললো, রবিবার আসবো। সেজ, কাল তুমি ছুটি নাও। আর আজ বসে হিসাব করো সেই দশটাকাটার দাম এখন কতো!'

পলু বললো, সাবাস চৈতু—তোর বোকামিতে মাঝে মধ্যে রাগ হয়ে যায়—আবার এমন কাণ্ডকারখানা বানাস যে অবাক হয়ে যাই।

বললাম, "চৈতু তোর জন্যই আমি অগ্নী হতে পারবো। তোর জন্যই খুঁজে পেলাম বোজকে।"

চৈতু বললো, সেজ জন্মভূমিকে কেউ ভুলতে পারে না— বিশেষতঃ মনে হয়, বৃদ্ধ বয়সে ছোট বেলার স্মৃতি ফিরে আসে বোজ পিসিও তাই এখানে ফিরে এসেছে।

বাবুর গল্প

(১)

ফেলারাম শিকারী

ফেলারাম? এ কেমন নাম!

ওকে কে বা কারা জঙ্গলে ফেলে রেখে গেসলো। জঙ্গলে পড়ে ছিল? ওর বাবা মাকে জন্তুরা মেরে ফেলেছিল? না—তার কাছাকাছি কোন মৃত মানুষের প্রমাণ পাওয়া যায়নি সে ছিল একটা কাঠের বাক্সে। গণেশ সর্দার তাকে দেখতে পায়।

গণেশের তখন কোন ছেলে ছিল না। গণেশ সর্দার ছিল দুর্ধর্ষ শিকারী-জমি জিরেতও ছিল। স্বামী স্ত্রীতে কাজ করতো। ভালোই চলতো তাদের দিন। ফেলারামকে পেয়ে গণেশের বৌ সুগন্ধাও খুব খুশি ছিল।

ফেলারাম ঠিক ফর্সা নয়, শ্যামলা রং—চোখ মুখ খুব কাটা কাটা সুন্দর—চুলগুলো কোঁকড়ানো। ফেলারাম মোটকথা গণেশের মতো দেখতে ছিল না। তুষারের কাছে যারা থাকে তাদের চামড়া অনেক বেশি সাদা হয়—এটা আমি বই পড়ে জেনেছি।

চারটে বছর ফেলারামের ভালোই কাটলো। শক্ত পাথুরে এলাকায় বেশ পোক্ত হল তার শরীর। এই সময় গণেশের বৌ সুগন্ধার ছেলে হল। রতন, ফেলারাম সরে এল গণেশের কাছে। গণেশ সামান্যই লেখাপড়া জানতো—কিন্তু সে বুঝেছিল লেখাপড়া জানাটা খুবই প্রয়োজন—তাই ফেলারামকে দিল পাঠশালায়। কদিনের মধ্যেই গণেশ বুঝলো-পড়াশুনোয় বেশ মন আছে ফেলারামের।

কিন্তু ফেলারামের সময় কম। রতন সামান্য বড় হতেই তাকে সামলানোর দায়িত্ব, তাকে কোলে নেওয়া বা-দেখভালের দায়িত্ব বর্তালো। মাকে তো রান্না করতে হবে-ক্ষেতীতে যেতে

হবে-লকড়ি আনতে হবে।

এইসব সূত্র ধরে—ফেলারামের সামান্য অবহেলা নিয়ে বকুনির সময় সুগন্ধা একদিন জানিয়ে দিল 'ফেলারাম এ বাড়ির সন্তান নয়—তাকে কুড়িয়ে আনা হয়েছে।' তখন ফেলারাম মাত্রই আট বছরের বালক।

ফেলারাম কাঁদলো অনেকক্ষণ। গণেশ তাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। সুগন্ধাকে বকুনি দিল। তবু ফেলারাম সত্যকে জেনে আর সহজে রতনকে ভালোবাসতে পারতো না। যদিও খুবই যত্ন করতো।

প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ হল আর পড়াশুনার সাঙ্গ হলো কেননা হঠাৎই কদিনের জ্বরে সুগন্ধা মারা গেল। সুগন্ধা তাকে বকুক, মারুক তবু সেইই তার মা ছিল—সেইই তাকে বুকেপিঠে করে মানুষ করেছিল। ফেলারাম খুব কাঁদলো কদিন ভাই রতনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। তারপর ফেলারাম মনে মনে শক্ত হল—রতনকে বড় করতে হবে। মায়ের ঋণ শোধ করতেই হবে।

বাড়ির সবকাজ জমি জিরেতের কাজ, রতনের লেখাপড়া সব দেখতে থাকলো সে। গণেশ কেমন যেন উদাস।

এমন সময় রতনের মামা এলেন—শার্ট, প্যান্ট, কোট পরা-শহরে মানুষ-কথায় কথায় ইংরাজী বলেন। তিনি গণেশকে বুঝিয়ে রতনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

গণেশ কদিন গুমরে গুমরে কাঁদলো। তারপর ফেলারামকেই জড়িয়ে ধরে বললো, তুইই আমার ছেলে। রতন তো বাবু হয়ে যাবে। আমায় আর তার বাবা বলে মানবে না।

ফেলারাম কম কথা বলে—হাসে কম, কাঁদে কম। নীরবে কাজ করে যায়। সময় পেলেই পালক পিতার তীর ধনুক, সড়কি বল্লম,তলোয়ার, ছোরাছুরি নিয়ে নাড়াচাড়া করতো।

তাকে এইসবে আগ্রহী দেখে গণেশ বেশ খুশি হল এবং এরপর থেকেই সে এইসব চালানোর শিক্ষা দিতে থাকলো ফেলাকে।

১২ বছর বয়সেই ফেলারাম শক্ত পোক্ত ১৬ বছরে জোয়ানের মত হয়ে উঠলো। তীর চালানোয় বেশ দক্ষ হলো এবং সুযোগ পেলেই পাখি মারতো। তার মাংস খেত। গ্রামের মানুষরা তো গরীব-পয়সা দিয়ে মাংস কিনে খাবে এত পয়সা নেই।

গণেশও লুকিয়ে চুরিয়ে ময়ূর মারতো, বনবরা মারতো, কখনও হরিণও মারতো। গ্রামের লোকজনকে সেদিন ভোজে ডাকতো। গণেশকে সবাই সর্দার বলতো। একা একা মাংস খায়না বলে গ্রামের লোকেরা তাকে ভালও বাসতো।

কাটলো এইভাবে আরও ৪টি বছর। ফেলারাম বৃষস্কন্ধ যুবক হয়ে দাঁড়াল। এতদিনে সে মনে করতে পারলো যে প্রয়োজনে বাঘকে সামনা করতে পারি। গণেশ সর্দারের যাবতীয় জ্ঞান সে দখল করেছে। লাঠি চালনায়, সড়কি ছোড়ায়, লক্ষ্যভেদে, কুঠার চালনায় সে গণেশের মতই সুদক্ষ হয়েছে।

এই সময় এক বসন্ত কালে গণেশ তাকে বললো 'গ্রামের এক মাইলের মধ্যে একটা ভালুক 'খতরনাক' হয়ে গেছে। তাকে মারতে হবে। একা গেলে ভয় আছে-যদি তুই সঙ্গে যাস ভাল হয়।

ফেলা তো এতদিন এরই এরই প্রতীক্ষায় ছিল। গণেশ বললো, তোকে দুটো বিষ তীর দেবো—বড় বা ভারী শিকারকে সহজে থামানো যায়না—তাই বিষতীরের সাহায্য নিতে হয়—আমি নেবো টাঙ্গি আর সড়কি। তুই নিবি তীর ধনুক আর কোমরে রাখবি ছোরা।

পর প্রভাতেই যাত্রা হলো শুরু। একটা গাছের গায়ে চুন লগিয়ে ফেলা তীর ছোঁড়া অভ্যাস করতো। যাবার আগে তিনটে তীর ছুঁড়ে নিজেকে খানিকটা প্রস্তুত করে নিল।

জায়গাটা স্তূপাকৃতি-ছোট ছোট টিলা পাহাড়ী এলাকা। বেশ বড় বড় গাছ আছে-নীচেও আছে ঝোপঝাড তবে সংখ্যায় কম। কয়েকটা গাছে বেশ বড় বড় মৌচাক আর আছে মহুয়ার ফুল। ভালুকের কাছে স্বর্গীয় স্থান। ভালুক মধু খেতে, মহুয়া খেতে খুব ভালবাসে।

ফেলারামকে গণেশ দাঁড় করালো পাথরের দেওয়ালের সামনে -জমি থেকে অনেকটা উচুতে-বললো সাবধান—তীক্ষ্ণ নজরে দেখবি সব—তীর চালাবি—দেখিস যেন না আমাকেই বিধে যায়।' ফেলা হাসল, বললো, ঠিক আছে বাবা।

গনেশ নেমে গেল। ফেলা গণেশকে দেখতে থাকলো। ফেলা বুঝছে যে এখানেই ভালুকটা আছে। কাছাকাছি কোথাও আছে ভালুকটার বাচ্চাগুলো। বাচ্চা হবার পর ভালুক ভয় দেখায় কামড়ে দেয়। গাঁয়ের কজনকে তাই করেছে—একজনের নাক কামড়ে তুলে নিয়েছে—একজনের পিঠ চিরে দিয়েছে নখের আঁচড়ে। দারোগা এসে গণেশকে বলেছেন, 'গণেশ এটাকে মারো।' তবেই বাবা এতে রাজী হয়েছে—নইলে, বলেছিল, 'বাচ্চাগুলো বড় হলেই চলে যাবে—ওকে মারবো না।'

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা 'সড় সড়' শব্দ শুনলো। চমক ভাঙল—গণেশকে খুঁজে পেল—সে এখন ৫০ গজ প্রায় চলে গেছে। তারপর দেখলো, একটা ভালুক নামছে একটা গাছ বেয়ে। চেঁচিয়ে উঠলো, 'বাবা ভালুক'।

ভালুক গণেশকে দেখেই রেগে নামছিল। গণেশ ভাল্লা নিয়ে প্রস্তুত। ফেলা চলে এসেছে অনেক কাছে—ধনুকে

জুড়েছে বিষতীর।

ভালুক গাছ থেকে নেমে টিলায় এসে দাঁড়াল—গর্জন করছে—হঠাৎ গণেশের ছোঁড়া সড়কিটা গিঁথে গেল বুকের পাশটাতে—ভালুকটা সামান্য টলে গেল-তারপর সড়কির লাঠিটা ধরে চিবিয়ে ফেললো। গর্জন করে লাফিয়ে নামলো নীচে।

ফেলাও লাফালো নীচে—হাতে তার বিষতীর জোড়া ধনুক ঠিক মত জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না সে। নীচে টাঙ্গি নিয়ে লুকিয়ে পড়েছে গণেশ। ভালুক হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল—বুক থেকে সড়কিটা টেনে বার করার চেষ্টা করলো—

প্রচণ্ড চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো গণেশের দিকে। গণেশ টাঙ্গি চালালো—মাথায় ঠিকমত লাগলো না—চোখের পাশে পড়লো কোপ—হাত দিয়ে টাঙ্গিটা ধরে নিল ভালুকটা। গণেশ গড়িয়ে পড়ে গেল খাদে—

ভালুকটা যন্ত্রনায় গড়াগড়ি খেল—ধীরে নামতে থাকলো খুঁজতে থাকলো গণেশকে। এমন সময় সামনে প্রশাস্ত বুক পেয়ে তীর ছুড়লো ফেলারাম। ভালুকটা গড়িয়ে পড়লো—গণেশের কাছেই।

গণেশের পায়ে জোর লেগেছে—তবু উঠে দাঁড়ালো। দেখলো, ভালুকটাকে, চেঁচিয়ে ডাকলো, ফেলা। ফেলা লাফিয়ে নামলো, দেখলো—ভালুকটা তখনও কাৎরাচ্ছে—উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।

ফেলা কোমর থেকে ছোরা বার করে ভালুকটার বুকে বসিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে ভালুকটা নট নড় চড়ন হয়ে গেল।

গণেশ সামলাতে সময় নিল। ভালভাবে দেখলো ভালুকটাকে সত্যিই মরেছে কিনা পরখ করলো। তারপর ছোরাটা, সড়কির

ফলাটা বার করলো টেনে—বললো, 'তীরটা থাক। টাঙ্গিটা খোঁজ জঙ্গলে। হাতিয়ার ঠিক রাখতে হবে।'

ফেলারামকে বসিয়ে রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই গণেশ গেল লোক ডাকতে।

অনেক লোক এল। দারোগা এলেন। গণেশকে ৫০, টাকা দিলেন। ভালুকের ডান থাবার একটা নখ নিয়ে রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলারামের গলায় পরিয়ে দিল গণেশ। মাথায় চুম্বন করে বললো , খুব বাঁচিয়েছিস আমাকে। ঠিক সময়ে এসে যদি ছোরা না চালাতিস তো ব্যাটা আমায় ঠিক মরণ কামড় দিত।'

এরপর ফেলারাম গেল এক চিতা শিকারে। মানুষ খেকো চিতা।

কোন বন্যপ্রানীকে 'খতরনাক' আখ্যা না দিলে তাকে মারা যায়না। মারলে তার শাস্তি হয়। ফেলারামের অবশ্য তাদের মারতে ভালো লাগেনা—দেখতে ভালো লাগে।

চিতাবাঘটা মারার জন্য সাহেব শিকারীরা এসেছেন। তারাই গণেশকে ডেকেছেন। গণেশ পাঠাল ফেলারামকে। বললো, এখানকার জঙ্গল ফেলার নখদর্পনে। আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি—এবার থেকে আমার ছেলে যাবে।'

সাহেল দেখলো ফেলারামকে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'খাওয়া ছাড়া ৫ টাকা পাবে রোজ।' ফেলারাম হাসলো, বললো 'যা খুশি দেবেন।'

গণেশ রাতে ফেলারামকে জানাল, খুব ভয়ানক চিতা—প্রায় দুশো লোককে মেরেছে—এক গ্রামে থাকেনা, পালিয়ে

বেড়ায়, খুব চালাক, ফাঁদ চিনতে পারে—চেহারা বড় নয়। বিষতীর নিবি—ঠিকআছে— কিন্তু ছোরা বা সড়কি নিতে ভুলিসনা। সাহেবকে বাঁচাতে হবে। পারলে সাহেবকে বলে রাইফেল চালাতে শিখে নিবি।

ফেলারাম জবাব দিলনা। পর প্রভাতে গণেশকে প্রণাম করে চলে গেল সাহেবের তাঁবুতে।

কদিন ঘুরলো সাহেবের সঙ্গে—এগ্রামে ওগ্রামে। সাহেবের রাইফেলটা কী ভারী। ওকে তা বইতে হচ্ছে। সাহেবও বইছে অনেক কিছু। পিঠের ব্যাগে আছে খাবার—ক্যামেরা দূরবীন—টোটা। সাহেবের চামরার বেল্টে আছে পিস্তল। তার পাশেই খাপে ঢাকা একটা ছোরা। সাহেব বেশ ভালোই তাদের ভাষা বলতে পারে। অনেক বছর সাহেব এই অঞ্চলে আছে।

কদিন পরে ফিরে এল নিজের গাঁয়ে। শুনলো, কাছেই একটা মানুষ মেরে চিতাটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল—গ্রামের লোকেরা লাঠি বল্লম নিয়ে তাড়া করায় ফেলে পালিয়েছে। সাহেব বললো, ফেলারাম—কাম কুইক—জলদি চলো—চিতাটা তাহলে এখনও এখানেই আছে।

সবেমাত্র অন্যগ্রাম থেকে পাঁচমাইল হেঁটে এসে ক্লান্ত লাগছিল ফেলারামের। কিন্তু চিতাটাকে পাওয়া যাবে জেনে মনে উৎসাহ এসে গেল। সাহেবের মতই দুখানা বিস্কুট চিবিয়ে চা খেয়ে সেও বেরিয়ে পড়লো—এদিকে ক্ষিধেয় তার নাড়ি ভুড়ি হজম হবার মতো।

কি আর করে সাহেবের সঙ্গে হাঁটছে। পিঠে সাহেবের থলি। সাহেবের হাতে রেডি করা রাইফেল—তার ডান হাতে সড়কি—বাঁহাতে একটা ছোট্ট কাটারী—পিঠে থলির পাশে

তীর আর ধনুক।

জঙ্গলের সীমানায় যেখানটা মড়ি পড়ে আছে তার কাছা-কাছি হতেই চিতাটাকে দেখতে পেল ফেলা। সাহেবকে বললো। সাহেব বললো, 'সাবধান।'

খুব ধীরে ধীরে তুদিকে সামনে পেছনে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছে তুজনে। টিলাটার কাছে যেতেনা যেতেই ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল চিতাটা—সাহেব সামান্য পিছিয়েই গুলি কোরলো—চিতাটা লাফিয়ে পড়েই আবার লাফ দিল গুলির আওয়াজে। সড়কিটা গিঁথেই রইল চিতার পেটে। সেটা নিয়েই পালালো বাঘটা।

ফেলারাম বললো, ভালো জায়গায় মারতে পারলামনা সাহেব। সাহেব বললো, এখন কথা নয় সাবধান- আহত বাঘ বড় ভয়ংকর।

ফেলারাম তীর জুড়লো ধনুকে—বিষতীর। পথটা সামান্য নীচু দিকে চলেছে তুপাশে ঘন ঝোপঝাড়। তারই মধ্য থেকে চিতাটা লাফিয়ে পড়লো ফেলারামের পিঠে। ফেলারাম মুখ থুবড়ে পড়ে গেল—তীরধনুক ছিটকে গেল—কানে এল 'কটাস' করে শব্দ-বাজ পড়লো যেন সাহেবের রাইফেল গর্জে উঠলো ফেলারামের কানে কোন শব্দ যাচ্ছেনা—ফেলারাম উঠে বসলো কোমর থেকে বার করে নিল ছোরাটা।

চিতাটা আহত হলেও মরেনি—ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। সাহেবের হাতেও নেই রাইফেল—সেটাও পড়ে আছে তলায় সাহেবের হাতে উদ্যত পিস্তল।

ফেলারাম হঠাৎ ছুটে চলে গেল চিতাটার কাছে। ঘাড়ের ওপর মারল ছোরার ঘা। চিতা বাঘটা থাবা দিয়ে আঘাত করলো। ফেলারাম পড়ে গেল চিৎ হয়ে—তারপর প্রচণ্ড জোরে ছোরটা বসিয়ে দিল বাঘের বুকটায়। বাঘটা তার

শরীরের ওপর পড়ে গেল। সাহেবের পিস্তলের আওয়াজ শুনলো সে। ঠেলেঠুলে বেরিয়ে এল বাঘের নীচ থেকে। রক্তে সাবাগা ভিজে গেছে।

সামান্য জিবিয়ে নিতে দিল তাকে। তারপর সাহেব বললেন দেখো ফেলারাম এই বাঘটা দুশোর বেশি মানুষ মেরেছে— কী চালাক আর কী জোর। এই দ্যাখো—এখানে তোমার বর্শা লেগেছে—নাড়ি বেরিয়ে পড়ছে—এখানে বুকের পাশে আমার রাইফেলের গুলি লেগেছে এই ঘাড়ের কাছে তোমার কোবার আঘাত এইখানে তোমার ছোরাটা বসে গেছে— আর এ্যাই দ্যাখো এখানে আমার পিস্তলের গুলি—তবেই বোঝো কী মহাশক্তি এই বন্য প্রাণীদের।

ফেলারামকেও গ্রামের সবাই বয়ে আনলো। তার পিঠে বাম বাহুতে নখের আঁচড়। সকলে মিলে আনন্দে তাকে স্নান করালো।

সাহেব দারোগাকে বললেন, এ বাঘ হল ফেলারামের। সেই প্রথম মেরেছে। ফেলারাম বললো, সাহেব বাঘ নিয়ে কী করবো—ওটা আপনিই নিন। দারোগা গণেশকে ২৫০, টাকা দিল বললো, এটাকা ফেলারামের—আর এই কাগজখানা যত্ন করে বাধিয়ে রাখিস—আজ থেকে ফেলারাম সরকারের স্বীকৃত শিকারী হয়ে গেল।

দারোগা চলে যাবার পর সাহেব একটা মস্তর হরিণ মেরে দিলেন। গ্রামের সমস্ত মানুষ সেদিন গণেশের বাড়িতে খেল। ফেলারাম তখন গ্রামের বীর।

এইভাবে ফেলারাম শিকারী হয়ে গেল। গণেশ তার বিয়ে দিয়ে দিল—গ্রামের এক অবস্থাপন্ন গোয়ালার মেয়ের সঙ্গে।

এক বছরের মধ্যেই গণেশ মারা গেল। ফেলারামের বৌ ময়না তাকে খুব সেবা যত্ন করতো। ময়নাকে সব জায়গা জমি টাকা কড়ির কথা বলে গেল গণেশ। তবু রতনকে খবর দিতে দিলনা।

তবু তার মৃত্যুর পর ময়না ফেলারামকে বলে রতনকে খবর দিল। রতন এল। সব দেখলো, শুনলো। সে পুরা সাহেব বনে গেছে। বললো, দাদা, বাবার আসল ছেলে তুমিই জঙ্গলে এসে আমি থাকবোনা। গ্রামপ্রধানের কাছে চলো— সব কিছু তোমার নামে করে দিয়ে যাই। ফেলারাম বললো, তা হয়না ভাই। বাবা আমায় অনেক দয়া করেছে—মানুষ করেছে—এসব তোরই থাকবে—এআমি নিতে পারবোনা।

ময়না বললো, ভাই, তোমাদের দান আমি নেবো হাত পেতে। রতন সব দানপত্র করে দিয়ে ফিরে গেল তার মাতুলালয়ে।

এরপর থেকেই নিকটে দূরে কোন বন্যজন্তু ঝামেলা করলেই ফেলারামের ডাক পড়তো। বন্যজন্তু মারতে ফেলারামের ভাল লাগতোনা—তবু মারতেই হতো। জীবিকার জন্য। শিকারের সময় মনে রাখতেই হয় "মারো নয়তো মরো।"
কে আর মরতে চায় বলো?

যাত্রীনিবাস

বহু বছর আগেরকা কথা। তখনও মানুষ বিজ্ঞানে এত উন্নত ছিল না। মানুষের চাহিদাও ছিল সীমিত অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়—এই তিনের ব্যবস্থা থাকলেই মানুষ খুশি ছিল। দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল। বড়কে প্রণাম করতে মানুষ মনে কোন দ্বিধা করতোনা।

অবশ্য ধনী মানুষ রাজা মহারাজারাও ছিলেন—তাঁদের বিলাসব্যসনও ছিল—তাতে সাধারণ মানুষ ঈর্ষা করতো না—এতটা বেশি করে। তারা জানতো, বুঝতো কম- তাই তাদের লোভও ছিল কম।

তবু মানুষ তো চিরকাল একই জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকেনা। পাহাড়তলীতে একটি ছোট্ট মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে থাকতেম স্বামী ভোলানন্দজী আর তার চেলা যোগজীবন।

পাহাড়ের মাথায় ছিল এক বড়, বিখ্যাত মন্দির। সেখানে শীতের তিন মাস বাদে সবসময়ই যাত্রী আসতেন। পাহাড়ের মাথায় চড়া কষ্টকর। অধিকাংশ মানুষই তাই পাহাড়তলির ছোট্ট মন্দির সংলগ্ন যাত্রীনিবাসে থাকতে বাধ্য হতেন।

সাধুজী আর তার চেলা ভক্তিভরে তাঁদের সেবা করতেন। শয়নের ভোজনের ব্যবস্থা করতেন। তাতে সামান্য আয় হতো তাতেই তাদের দেবসেবা ও আত্মসেবা চলে যেতো। যাত্রীরাও তাঁদের সেবায় মুগ্ধ হতেন এবং গৃহে ফিরে সকলের কাছে তাঁদের প্রশংসা করতেন।

কিন্তু জীবন তো থেমে থাকেনা। একবার স্বয়ং রাজামশাই সদলে এলেন উপবেব বিখ্যাত মন্দিরে পূজা দিতে। তাঁদের ইচ্ছা ছিল অশ্বপৃষ্ঠে একদিবসেই এই পথশ্রম কাটিযে দেবেন। কিন্তু পথিমধ্যে বানীজীব হল জ্বব।

বানীব কষ্টে বাজা পথিমধ্যে পাহাডতলিতে থামতে বাধ্য হলেন। বাজাব লোক যাত্রীনিবাস এসে তাব বুশ্রীতায পঞ্চমুখ হযে বাজাকে জানাল। বাজা যাত্রীনিবাসেব সামান্য দূবত্বেই শিবিব স্থাপনেব নির্দেশ দিলেন।

বাজাব লোক এসে যাত্রীনিবাসে জানাল, 'আগামীকাল্ই মহাবাজ যাবেন তীর্থদর্শনে। আগামী কাল অন্যজন তীর্থে গেলে গেলে দেবদর্শনে বাধা পাবে।"

যোগজীবন সে নির্দেশের কথা জানাল তাব গুরুদেব ভোলানন্দজীকে। তিনি বললেন, 'বাজাব আদেশ শিবোধার্য।' যোগজীবন নিজেব বিবক্তি চেপে চলে গেল নিজেব কার্যে— এতগুলো যাত্রীব নিত্য প্রযোজনীয সামগ্রীব ব্যবস্থায।

সন্ধ্যাব প্রাক্কালে দেবপূজা সমাপনান্তে ভোলানন্দ সশিষ্য রাজসন্নিধানে গেলেন। বাজা ও বাজবৈদ্য তখন ছিলেন সেখানে। পরিচয় শেষে ভোলানন্দ বললেন, "সেবাব সুযোগ দিতে পাবতেন।" বাজা মৃদু হেসে বললেন যাত্রীনিবাস আমাদেব পক্ষে অনুপযুক্ত। অপবিচ্ছন্ন এবং দীন'। ভোলানন্দ বললেন দীন'তা স্বীকাব কবছি। তবে এ সব কর্তব্য তো ভূস্বামীরই। আমবা সাধ্যমত সেবা কবতে পারি মাত্র। রাজবৈদ্য বললেন আপনাব সেবাব প্রয়োজন নেই—তবে শুনেছি আপনি ভাল ঔষধ প্রস্তুত কবে থাকেন। বানীমা অসুস্থ—আমার কাছে থাকা ঔষধে তিনি সুস্থ হযে উঠছেন না।

ভোলানন্দ বললেন, পূর্বাশ্রমে আমি ছিলাম এক কবিরাজ তাই সামান্য ঔষধ দিয়ে থাকি যাত্রীদের। যদি আদেশ করেন তবে দিতে পারি ঔষধ। কী কী কষ্ট হচ্ছে তাঁর তা জানতে হবে।

রাজবৈদ্যর কাছে সব শুনলেন, জানালেন 'ঔষধ নিয়ে আসবো।' দুদিন ভোলানন্দ কাটালেন রাজশিবিরে।
যোগজীবনের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটলো বারবার। এতে যাত্রী সমাগমে একা পড়ে গিয়ে সে বিষম কষ্ট পেল।

অন্যদিকে রাজা কয়েকজন বিশিষ্ট প্রহরী এবং দেহরক্ষী নিয়ে দেবদর্শণ সেরে এলেন এবং রানীকে সুস্থ দেখে দ্রুত ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

যোগজীবন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বললো, বাঁচলাম গুরুদেব এই ধনীমানুষদের দেখলেই আমার ভয় করে। ওদের কথায় আমাদের চলতে হয়।
পান থেকে চুন খসলেই ধড় থেকে নেবে যাবে মুণ্ডু বাবা। অথচ সাধারণ যাত্রীরা কত ভাল। গতরাত্রে যাত্রীতুলনায় ঘর ছিল কম।
অনুরোধ করলাম, পুরুষরা একঘরে, নারী আর শিশুরা একঘরে শয়ন করুন। সকলেই দ্বিধাহীন ভাবে তা পালন করলেন।

ভোলানন্দ বললেন, বৎস আনন্দিত হও। কাল ও পরশু তোমার খুব কষ্ট হয়েছে। যোগজীবন বললো না গুরুদেব— এসব কষ্ট সহ্য করতে পারি—কিন্তু অবজ্ঞা সইতে পারি না। যাত্রীনিবাসে আমি ভালোই ছিলাম।

গুরু বললেন, যোগজীবন অবজ্ঞাও সইতে হবে। হাসলেন যোগজীবন হাতজোড় করে বললে, সেই শক্তি দিন গুরুদেব। ভোলানন্দ হাতের মুদ্রায় তাকে অভয় জানালেন।

তিনদিন পরে রাজপুরুষ এল। ভোলানন্দজীকে বললো, "রাজামশাই এই পাঁচ হাজার মুদ্রা আপনাকে পাঠিয়েছেন। রানীমার সেবা করার জন্য।"

ভোলানন্দ বললেন, "গুরুজীর আদেশ—সেবামূল্য নিতে পারিনা এ তুমি ফিরে নিয়ে যাও বৎস।" রাজপুরুষ ফিরে গেল। যোগজীবন বললো, 'গুরুদেব—রাজাদেশ পালন করলেন না—বিপদ হতে পারে।' ভোলানন্দ বললেন "এত অর্থ-আমি গ্রহণ করতে পারিনা বৎস -এত অধিক অর্থ মনে লোভ জাগাবে।"

যোগজীবন বললো, মনে হয় রাজামশাই যাত্রীনিবাসের সংস্কারমানসেই এই অর্থ পাঠিয়েছেন। ভোলানন্দ বললেন, রাজপুরুষ তা বলেননি—তাছাড়া সংস্কার করাতে হলে তিনিই তা করাতে পারেন—আমি সন্ন্যাসী মানুষ- আমি তা করবো কেমন করে।

এসব কথা তো রাজা জানলেন না। তিনি সন্ন্যাসীর স্পর্ধায় ক্রোধে অস্থির হয়ে রাজবৈদ্যকে বললেন, "এর শাস্তির ব্যবস্থা করো।"

রাজ বৈদ্যর কথামত প্রহরী গিয়ে ভোলানন্দকে ধরে এনে কারাগৃহে বন্দী করে রাখলো। রাজা নানান কার্যে ব্যস্ত থাকায় এ প্রসংগে কিছুই জানেন না বা তাঁকে কিছুই জানানো হোলনা।

শৃঙ্খলিত অবস্থায় ক্রন্দনরত যোগজীবনকে ভোলানন্দ বলে এলেন, সবই দেবতার ইচ্ছা। সাধারণ যাত্রীদের কথা ভুলে রাজার সান্নিধ্য পেতে চেয়েছিলাম—সেই লোভে এই শাস্তি। দুঃখ করোনা—তুমি নির্ভয়ে কাজ করে যাও।'

একা যোগজীবনের পক্ষে যাত্রীনিবাসের পরিচালনা করা কঠিন ব্যাপার। কোন কোনদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে দেবসেবার

কথাই মনে থাকে না। অন্য যাত্রীদের নিয়ে বিশেষ ভাবনা করতে হয় না—কেননা সাধারণ যাত্রীরা অধিকাংশই কর্মঠ এবং নিজ নিজ কাজ নিজেরাই করে নেয়; কিন্তু অসুস্থ কোন যাত্রী এলে তখন বিষম কাজের চাপ পড়ে।

গুরুজীর কাছে শেখা চিকিৎসা বিদ্যাই প্রয়োগ করে যোগজীবন। যেদিন গুরুজী চলে গেলেন— সেদিন সন্ধ্যায় নেমেছিল বিষম ঝড়বৃষ্টি—সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই যাত্রীনিবাসের দ্বারে দেখল এক সুন্দর তরুণ বালককে। কিন্তু সে হাঁটতে পারছে না—তার পদযুগলেই ক্ষত—জীর্ণ তার বসন, শীর্ণ তার তনু। উজ্জ্বল তার চোখ, ভাষা তার সুললিত, সুমিষ্ট তার কণ্ঠস্বর।

দীর্ঘ পনেরো দিন পরে সেই কিশোর পদচারণায় সক্ষম হলো। যোগজীবন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এই প্রথম স্বাধীন ভাবে সে চিকিৎসা করল এবং সফল হল।

কিশোর যোগজীবনের পাদুটো ভিজিয়ে দিল চোখের জলে যোগজীবন বললো, একি করছ বৎস ওঠো। কিশোর বললো আমার বিক্ষত পা ছুঁয়েছেন কতবার সেই অপরাধের স্খলন হবে কী করে?

যোগজীবন তখন বললেন একাম্বরম—আমার মনে শান্তি নেই গুরুজী রাজকারাগারে বন্দী। বলে সকল ঘটনা বললো। একাম্বরম বললো, এত অন্যায় বিচার চাইতে হবে। যোগজীবন বললো কে যাবে? একাম্বরম বললো, আমি যাব। যোগজীবন বললো, তোমার পায়ের ক্ষতর সম্পূর্ণ আরোগ্য হোক তবে যাবে। একাম্বরম নীরব।

সেদিনই দ্বিপ্রহরে ভোজনের পর যোগজীবন বললো, তোমার

নাম ছাড়া কিছুই জানিনা একাম্বর।

একাম্বর বললো, সমতলের দক্ষিনতম প্রান্তে থাকতাম। আমাদের পূর্বপুরুষ সঞ্চিত বিশাল ধনসম্পদ ভারত বিখ্যাত। সেনবংশ-সুবর্ণ বনিক তনয় আমি। বর্তমানে ভাগ্য বিতাড়িত পিতৃব্য কর্তৃক প্রবঞ্চিত সম্পদহীন। পিতৃব্যদের শুভ হোক। তাঁদের লোভই আমাকে গৃহের অঙ্গন থেকে বিশ্বের প্রাঙ্গনে বাহির করেছে। সেই দশমবর্ষ বয়ঃক্রম থেকে আজ চতুর্দশ বৎসরে উত্তীর্ন হয়েছি। চারি বৎসরের এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছি বত প্রকারের কার্য সাধন করেছি। আপনার এই শুশ্রূষার মূল্য পরিশোধ করবোই।—অবশ্য এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না। কিন্তু দাদা, অপনি তো যুবক মাত্র, আপনি কেন এলেন এই পথে।"

যোগজীবন বললো, "পূর্বাশ্রমকে স্মরন করা অনুচিত তবে তা এমন কিছু নয় যে মনের মধ্যে পাপ হবে। জানো অম্বর অত বড় নামকে একটু ছোট করে দিচ্ছি ভাই—জানো আমিও তোমারই মত ভাগ্যবিড়ম্বিত। তবে জন্ম দরিদ্র, পিতা ছিলেন সূত্রধর। শৈশবেই মাতৃহারা। পিতার মৃত্যুর পর ভিক্ষাই বৃত্তি ছিল। ভিক্ষা করতে করতেই একদিন এখানে আসি। গুরুদেব তখন কুটির নির্মানে সচেষ্ট। শীত তখন আগতপ্রায়। কাঠ কাটায় গুরুর তুলনায় আমার ক্ষমতা বেশিই ছিল-ছুতোর বাড়ির ছেলে, ফলে প্রায় একার চেষ্টায় ছুটি কুটির নির্মান করে ফেললাম। পাথর সাজিয়ে দেবপ্রতিমার মন্দিরও তৈরী করলাম। তখন গুরুদেব আমায় পরহিতব্রতে দীক্ষা দিলেন। তীর্থযাত্রীদের অর্থ এবং কর্মসাহায্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল মন্দির এবং যাত্রীনিবাস বেশ ছিলাম। এমন সময় রাজারানী এলেন। ফলতো তোমায় আগেই বলেছি ভাই।"

অম্বরের পা ভাল হয়ে গেছে। কেবল ডান পায়ের তলায় সামান্য ক্ষত আছে। ওষুধ দিয়ে কাপড়ের পট্টি বাধা আছে। সেই পা নিয়েই সে হাঁটে—যোগজীবনের সঙ্গে কাজ কর্ম করে—পাহাড়তলীর বনে জঙ্গলে পায়চারী করে। একদিন প্রভাতে যোগজীবন দেখল একাম্বর নেই। না, কাউকে কিছুই বলে যায়নি। মন খারাপ হয়ে গেল যোগজীবনের। ভাবলে মিষ্টভাষী কিশোরটী এক তঞ্চক।

অন্যদিকে একাম্বরম চলেছে রাজধানীর দিকে। একটি মাত্র উদ্দেশ্য তার। গুরুর মুক্তি। জানে শিবাজী বাধা দেবে বলবে আগে পুরো সারো এদিকে গুরুদেব যে কারাগৃহে কী কষ্ট পাচ্ছেন! প্রথমেই যেতে হবে রানীমার কাছে—তাঁকেই জানাতে হবে। তাঁর দয়াতেই গুরুদেবের মুক্তি সম্ভব।

ভিক্ষান্নে দিন কাটিয়ে, বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করে পাঁচদিন পরে এল এক তন্তুবায় গৃহে। 'কিছু অন্ন দিন মাতা।' বলে দাঁড়াল বাহির দ্বারে।

পুত্র হারা তন্তুবায় গৃহিনী বাইরে এসে দেখল সেই কিশোরের করুণ মুখ। দুঃখে তাঁর প্রাণ গলে গেল। একাম্বমরকে ডাকলেন ভিতরে—তার আহার্য্যের ব্যবস্থা করলেন।

তার আহার্য্যের স্বল্পতায় অবাক হলেন। বললেন, 'আরো দুটিখা বাবা— এত অল্পে কী কারো পেট ভরে? এই তো বাবা তোদের খাবার বয়স।' অম্বর বললো "মা ভিক্ষান্নে পরান্নে জীবন পালন করি—স্বল্পেই তাই তুষ্ট থাকতে হয়—তাই যেদিন জোটেনা সেদিনও কষ্ট লাগেনা।"

পুত্রহারা তন্তুবায় গৃহিনীর মনে ঝড়। নানান প্রশ্ন করলেন। জবাব পেয়ে খুশি হয়ে বললেন, আজ থেকে তুমি

থাকো আমার পুত্র হয়ে—ভিক্ষার প্রয়োজন নেই।' বলে ডাকলেন স্বামীকে। সব বললেন। স্বামী ব্যবসায়ী মানুষ। পুত্রশোক—বিধুবা স্ত্রীর কথায় বাধা দিলেননা. বললেন, "ঠিক আছে খোকা, থাকো আমাদের সন্তান হয়ে।"

একাম্বর তখন তার রাজধানীতে আসার উদ্দেশ্য জানালে তন্তুবায় বললেন. সেকী ভোলানন্দনী কারাগারে! তিনি তে সাক্ষাৎ দেবতা। আগামী কালই যাব রানীমাতার কাছে কিছু বস্ত্র দিতে—আমি জানাবো এই কথা। ছিঃছিঃ—আমরা যখন তীর্থে গেসলাম তিনি কী সেবাটাই না করেছেন। আমি আজই বলবো প্রতিবেশীদের।

একাম্বরম বললো, বাবুজী আমায় আপনার সঙ্গে নেবে আমি বস্ত্রবহনকারীরূপে যাবো। তন্তুবায় গৃহিনী বললেন, ত হয়না বাবা। একাম্বরম বললো, হয় মা। আমি তো পরা জীবি—আপনার অন্নের ঋণ তো শোধ করা চাই মা—বাবুজী বস্ত্রবহনে আমার কোন অসম্মান হবে না—এতদ্ব্যতীত রানীমাতাকে আমি যতটা বোঝাতে পারবো বাবুজী তা ততটা পারবেন না।

রানীমা একাম্বরমের বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হলেন। তুমি ক সত্য বলছ বালক? একাম্বরম বললো, হ্যাঁ রানীমাতা আপনা সেবার সুন্দর পুরস্কার পেয়েছেন গুরুজী। রানী বললেন. উনি রাজপুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন কেন?

একাম্বরম বললো, উনি প্রত্যাখ্যান করেননি-অক্ষমত প্রকাশ করেছিলেন রাজপুরুষ ফিরে এসে কী বলেছেন তা তো তিনি জানেন না। গুরুজীকে বিচার সভায় প্রেরণ কর তখনই সত্যাসত্য জানা যাবে রানীমাতা।

রানী বললেন, যাত্রীনিবাসে তো তোমায় দেখিনি। তন্তু এ

যুবক ছিল। একাম্বরম বললো, আমিও অসুস্থ ছিলাম। যোগজীবনদাদার সেবায় আমি সেরে উঠেই চলে এসেছি আপনার কাছে। এই বাবুজীর গৃহে পেয়েছি আশ্রয়।

রানী বললেন, নিশ্চিন্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করো। আগামী কাল আসবে বিচার সভায়। নয়তো আজ আমার অবরোধে থাকো।

একাম্বরম বললো "না মাতাজী—এই বস্ত্রগুলি বহন করবো—আমি আগামী কাল বিচার সভায় অবশ্যই আসবো।"

রাত্রে রানীর কাছে শুনে রাজা রাজবৈদ্যর উপর প্রচণ্ড রেগে গেলেন। 'ছিঃ ছিঃ ধিক আমাকে!' বললেন।

পর প্রভাতেই রাজাদেশে শৃঙ্খলমুক্ত ভোলানন্দ এসে উপস্থিত হলেন রানীমাতার কক্ষে। রানীজী তাঁর পাদবন্দনা করলেন। স্বামীর হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করলেন। রাজাও ক্ষমা চাইলেন, প্রণাম করলেন। ভোলানন্দ বললেন, এতে আপনার কোন দোষ নেই মহারাজ—রাজা তো সব দেখতে পারেন না তাই বলা হয় রাজা 'কর্নৈঃ পশ্যতি।' মনে হয়, রাজবৈদ্য ভয় পেয়েছেন—তারই ছলনায় আমার শাস্তি। হোক তাতেও রাজবৈদ্যকে শাস্তি দেবেননা এই অনুরোধ। তিনি জীবিকার জন্য ভয় পেয়েছিলেন—ভেবেছিলেন এর পর রানীমাতা অসুস্থ হলে তাঁর পরিবর্তে আমাকেই আহ্বান করবেন।

রাজা বললেন, "হ্যাঁ সত্যই সেকথা তাকে বলেছিলাম।"

ভোলানন্দ বললেন, মহারাজ আপনি ডাকলেই আমি আসবো—কিন্তু রাজবৈদ্য তো হতে পারবো না। ভগবান যাকে যে কাজ দিয়ে পাঠিয়েছেন—তাকে তাই করতে দিন।

বিচার সভায় এসে একাম্বরম দেখে এক সন্ন্যাসী রাজার পাশে উপবিষ্ট। তন্তুবায় এক রাজপুরুষকে প্রশ্ন করে জানলো প্রভাতেই ভোলানন্দনীকে রানীমাতার কক্ষে নিয়ে রাজরানী তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। একম্বরম তাই শুনে বুঝে নিল, ঐ সন্ন্যাসীয় ভোলানন্দ।

সকলে উপস্থিত হবার পর রানীমাতা ঘোষককে বললেন, একাম্ববম নামক বালককে সম্মুখে আসতে বলো।
একাম্বরম নিকটে এসে কব জোড়ে প্রণাম নিবেদন করল, বাজাকে, রানীকে, সভাস্থ সকল মহাজনকে, বললো, আমি এক বালক মাত্র। আমার আবেদন সার্থক হয়েছে। মহারাজ, মহাবানীমাতা আমায় ক্ষমা মকন। গুরুদেবকে প্রণাম করবার জন্য মন আমার ব্যাকুল।

রাজা বললেন, "এস একাম্বরম।" একাম্বরম গুরুদেবকে প্রণাম করল পরে রাজা ও রানীকে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করল। সভাস্থ সকলকে কর জোড়ে প্রণাম জানিয়ে বললে, আমি ধন্য। সবাই আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

রাজা বললেন, একাম্বরম তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক। তোমার কাজে আমি অতীব সন্তুষ্ট। এখন তোমায় একটি কাজ দিতে চাই। একাম্ববম করজোড়ে বললো, আদেশ করুন, আমাব সাধ্যায়ত্ত হলে তা করবই।

রাজা বললেন, পঞ্চ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করো এবং যাত্রি-নিবাসের বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য যোজনা কর।" একাম্বরক বললো, দায়িত্ব নিতে পারি কর্মের—কিন্তু এত অধিক অর্থ অরক্ষিত থাকা অনুচিত মহারাজ। আমি যোজনা মত অর্থ রাজকোষ থেকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করবো।

সকলেই 'সাধু সাধু' বলে তাকে সমর্থন করলো। বহু মানুষ এলেন ভোলানন্দকে, রাজাকে, রানীকে প্রণাম করতে।

যাত্রীনিবাসে একাম্বরম সহ গুরুদেবকে ফিরতে দেখে যোগজীবন প্রথমে হতবাক। পরে একাম্বরমকে সন্দেহ করার জন্য লজ্জিত হলো। বললো, একাম্বরম, তুমি অসাধ্য সাধন করেছ।

একাম্বরম বললো, আমি কেবল রানীমার কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। তারপর যা করার তিনিই করেছেন। জানো দাদা, গুরুদেব তোমার ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন।

যোগজীবন বললো, 'কোন আমি তো তোমায় পাঠাইনি।' একাম্বরম হাসলো। বললো "পায়ের ক্ষতে ঠিকমত ওষধি দাওনি ভাই।" যোগজীবন উত্তেজিত ভাবে বললো, "তুমি ওই পা নিয়ে এতদিন হাঁটবে তা কী আমায় বলেছিলে? না বলেই তো পালিয়েছিলে? আমার যে কী কষ্ট হয়েছিল তা কী জানো?' একম্বরম বললো "দাদাজী ক্ষমা করো—বললে তুমি ছাড়তে না নিশ্চয়ই। তাহলে গুরুদেবের মুক্তি পেতে দেরী হতো হোতনা?'

যোগজীবন কথা বলতে পারছে না। একাম্বরম যে এতটা ভাল তা সে ভাবতেই পারেনি। তখন আবার তাকে ভয় পাওয়াতে হাসতে হাসতে একাম্বরম বললো, "রাজার আদেশে আমি সেই পঞ্চ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করেছি। এখন ঠিক করো যাত্রীনিবাসের উন্নতি কিভাবে সম্ভব করবে।"

যোগজীবন বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করলো, "এত অর্থ তুমি সঙ্গে এনেছ? দস্যুরা তা কেড়ে নেবে।' একাম্বরম বললো, "পরে সব কথা হবে, চলো গুরুদেরের পদবন্দনা করি।" "তিনি তো সব অবগত আছেন।"

যোগজীবন বললো, তিনি আত্মসংস্কারে ব্যস্ত। এত দীর্ঘদিন কারাগারে ছিলেন। এখন চলো যাত্রীনিবাসের সৌন্দর্য্য যোজনা করি।

কতদিন ধরে অর্থকষ্টে ভুগছে যোগজীবন। অর্থ পাওয়া গেলে কিভাবে উন্নতি করা যায় তা সে ভেবে এসেছে এতদিন। প্রথমে বিহ্বল হলেও যোগজীবন পরে ভাবতে শুরু করেছে।

পদবন্দনায় তুষ্ট ভোলানন্দজী বললেন, একাম্বরম তুমি তো কিশোর মাত্র, তুমি তো আমাকে আগে দেখওনি—কেন তবে তুমি গেলে আমায় মুক্ত করতে? একাম্বরম বললো, "গুরুদেব, যোগজীবন দাদার কাছে শুনেছি শুনেছি, সমতলের হাজার মানুষের কাছে—আপনার কাছেই তো এসেছিলাম আপনাকে পেলাম না—তবুও পেলাম যোগজীবন দাদার মধ্যে। সব কিছু জেনে মনের মধ্যে জন্ম নিল প্রতিজ্ঞা।'

ভোলানন্দ বললেন, "এই যে রাজার কাছে যাত্রীনিবাসের শ্রীবৃদ্ধির দায়িত্ব নিলে-তা পালন করতে পারবে?"

একাম্বরম বললো, গুরুদেব আমি সুবর্ণবনিক সন্তান—অর্থ সম্বন্ধে, লাভ সম্বন্ধে আমার জন্মগত সংস্কার বর্তমান—তাছাড়া চারি বৎসরের পদ পরিক্রমার সময়কালে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করেছি তা আমাকে কঠিন করে দিয়েছে। এছাড়াও রাজসভাতেই আমি ভেবেছি—আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, দাদা কর্মী বাড়ির সন্তান আর আমি সুবর্ণবনিক তনয় আমাদের ত্রিশক্তিতেই—যে কোন কর্ম সম্পাদনা করতে পারবো। আপনি কেবল আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব।

যোগজীবন বললো, কিন্তু ভাই, এই বয়সে তোমার অধ্যয়ন করা উচিত। একাম্বরম বললো, হ্যাঁ—সে বিষয়েও চিন্তা

করেছি। আপনার কাছে পড়বো পরে যাবো তন্তুবায় মাতার কাছে। তাঁর কাছে-যদি তিনি আশ্রয় দেন ত'বে পঞ্চবর্ষব্যাপী অধ্যয়ন করবো। তারপর ফিরে আসবো এই যাত্রীনিবাসে।

ছয়মাস বাদে রাজা সংবাদ পেলেন যাত্রীনিবাস নবকলেবর ধারণ করেছে। সপার্ষদ রাজা ও রানী এলেন। একাম্বরম অর্থের হিসাব দাখিল করলো। দেখা গেল, তখনও এক সহস্র মুদ্রা অব্যয়িত।

রাজা প্রশ্ন কবায় একাম্বরম জানালো যাত্রীদের স্বেচ্ছাশ্রমই এই ব্যয়হ্রাসে সাহায্য করেছে।

রাজা যোগজীবনকে যাত্রীনিবাসের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন গুরুদেব হলেন আশ্রম অধিকর্তা। একাম্বরমকে বললেন, তুমি রাজধানীতে এসে রাজকার্যে যোগ দাও। রানী বললেন, না, একাম্বরমকে পড়তে হবে ওর তো এখন পড়ার বয়স।

একান্তে ডেকে রানীমা বললেন, "একাম্বরম আমি প্রসন্ন নই।' একাম্বরম বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো' কেন মাতা?'

রানীমা বললেন, সাধারণ যাত্রীদের নিবাসকে তুমি ধনীদের জন্য প্রশস্ত করলে—এবপর ওরা কষ্ট পাবে। একাম্বরম বললো, "না রানীমাতা—আপনি জানেন এ যাত্রীনিবাসের দায়িত্ব বর্তমানে রাজামহাশয়ের। যোগজীবন দাদা কর্মাধ্যক্ষ তিনি ধনীর নিকট অর্থ নেবেন, দরিদ্র যাত্রীদের জন্য ব্যয় করবেন। ফলে রাজকোষেও হাত পড়বে না।"

রানীমা বললেন, "সেবা প্রতিষ্ঠানকে তোমরা কর্মপ্রতিষ্ঠানে -ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত করলে!" একাম্বরম হাত জোড় করে বললো, "আমি সুবর্ণবনিক সন্তান-এ ছাড়া আমি ভাবতে পারিনি মাতা -দাদাজী, আমি পরান্নজীবি—ভিক্ষা বৃত্তি ছিল

'আমাদের—আমাদের হাতে অর্থ আসতে তাকে আমরা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র তৈরী করেছি যাতে আমরা পরান্ন জীবিকা থেকে উন্নত হতে পারি।"

রানীমা বললেন, "তবু, কেন জানিনা, গতবারের সেই যাত্রীনিবাসকেই আমার ভাল লেগেছিল-বাইরে সেটা সুন্দর ছিল না, কিন্তু অভ্যন্তরে ছিল গুরুজীর পরম সেবাময়, করুণাময় হৃদয়-এখন তোমরা তাকে এনে দিলে হতাশা-সুবর্ণ বনিকের লোভ আজও তোমায় ত্যাগ করেনি।"

একাম্বর এ প্রশ্নের, এই মীমাংসার কোন জবাব দিতে পারল না।

— o —

তস্কর চান্দ্রেয়

শৈশবে পিতৃহীন চান্দ্রেয় দারিদ্র্য সীমায় বসবাস করতো। শরীর তার শীর্ণ—অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতো এবং প্রতিবেশী বালকদের ঐশ্বর্যে মনে মনে হিংসা পোষণ করতো।

তার মা ছিল মুখরা এবং প্রচণ্ড সত্যভাষিনী—ধনীগৃহে দাসী বৃত্তি করতো। একমাত্র সন্তানকে মানুষ করার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতো। কিন্তু চান্দ্রেয় ছিল অলস-তার চোখে কেবলই ধনীবালকদের পরিচ্ছদ আহার ইত্যাদি ভাসতো-সে ছিল লোভী।

এই লোভই তাকে ঠেলে দিল চৌর্য্যের পথে। তার হাত-সাফাই বহুদিন পর্যন্ত কেউ ধরতেই পারেনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হতেই চান্দ্রেয় নিজেকে 'বড় হয়ে গেছি' ভাবতে থাকলো।

এই সময়েই একদিন তাদের রাজ্যে নবাগত এক ভদ্রমানুষের মোটবহন করার কাজ নেয় এবং সেই বৃদ্ধকে পিছনে ফেলে রেখে পুরা মাল নিয়ে এনে তোলে ঘরে। কার্যকারণবশতঃ সেই সময়ে দৈবাৎ তার মা ঘরেতেই ছিল।

তার মা তাকে প্রহরী ডেকে ধরিয়ে দেয় এবং বৃদ্ধ-ভদ্রলোককে তাঁর মোট ফিরিয়ে দেয়। রাজা কঠিন শাসক হলেও প্রথম অপরাধ বলে বালক চান্দ্রেয়কে ক্ষমা করেন এবং তাকে সীমান্তবর্তী বনাঞ্চলে পাঠিয়ে দেন।

রাজ্যের নাম পদ্মাবতী নগর। রাজা নগেন্দ্রশংকর রানী সুপ্রভা, রাজপুত্র শংখচূড় এবং চন্দ্রচূড়। শংখচূড় রাজার প্রথম রানীর সন্তান—বর্তমান রানীমাতা তার বিমাতা।

শংখচূড় বীর যোদ্ধা, বিশাল দেহী, সুন্দর। একবিংশতি বয়ঃক্রম হতে পিতা রাজা নগেন্দ্রশংকর তাকে সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা করে দিয়েছেন। শঙ্খচূড় বিদ্বান, মৃদুভাষী, সকল

প্রজার নিকট সহজ। হাটের দিন হাটের মাঝেই সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বিচার করে, শাস্তিও দেয়, পুরস্কারও দেয়।

প্রজারা তাকে মানে এবং ভালবাসে তার সহজতাকে। অশ্বপৃষ্ঠে আসা যাওয়া করলেও অঙ্গে রাজকীয় পোষাক থাকলেও তার মনে কোন গর্ব নেই। শঙ্খচূড় বাল্যে মাতৃ হীন—মনে মনে ভালবাসার কাঙাল।

তস্কর চান্দ্রেয় এসে পড়ল শংখচূড়ের শাসনাধীন অঞ্চলে। এলাকাটি কঠিন। উত্তরে হিম অঞ্চলের পর্বত প্রান্তল এবং পশ্চিমে ঘন বন। বনের অন্যপ্রান্তেই শঙ্খনগর। শংখনগর সমতল এবং সমৃদ্ধ। দুইরাজ্যে বিবাদ এবং দুই রাজ্যেই অন্য রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর শাসকীয় ব্যবস্থা আছে। অন্যরাজ্যের অধিবাসীদের এরা ঘৃণা করে।

চান্দ্রেয় এখানকার শোধনাগারের শাসন মানতে পারছিলনা এত কাঠিন্য এবং এত শ্রম তাকে কষ্ট দিচ্ছিল তাই সুযোগমত সে একদিন ঘন বনের মধ্যে পালাল।

মৃত্যু চুদিকেই ভেবে চান্দ্রেয় ভয় না পেয়ে এগুতেই থাকলো। একসময় পেল এক ঝর্ণার সন্ধান। জল পেয়ে সে খানিকটা শান্ত হল। তৃষ্ণা নিবারণ করে বনের গাছে ফল সন্ধান করতে করতে পেয়েও গেল। এমন ভাবে কয়েকদিন কাটাবার পর তার মনে সাহস সৃষ্টি হল। ঝর্ণার সোঁতা ধরে নামতে নামতে পেয়ে গেল এক হ্রদ।

সেদিন সে আর অগ্রসর হল না। মনে মনে বুঝে নিল এসে গেছি শঙ্খ নগরে। এখানের লোক যদি জানতে যে সে পদ্মাবতীনগরের বাসিন্দা তবে তাকে এরা জ্যান্ত কবর দেবে। এমন কথা সে পড়েছে তার বইয়ে।

ফিরতেও ইচ্ছা হচ্ছে না, এগুতেও ভয়। শেষ পর্যন্ত ভয়কেই জয় করলো— হ্রদের পাশে সুসজ্জিত কানন দেখে বুঝল ধনী মানুষদের যাতায়াত আছে। বনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে উত্তর দিকে পেল এক প্রশস্ত রাজপথ। দিকনির্ণয় করে সে বুঝলো-এই পথ চলে গেছে তাদের রাজ্যের দিকে। এই পথের মাঝে আছে অর্গলবদ্ধ রুদ্ধ কপাট যা দুরাজ্যকে ভাগ করেছে।

ফলতঃ পূর্বদিকে না গিয়ে সে পশ্চিম দিকে চলতে থাকলো পরনে তার কয়েকদিনের নোংরা পোষাক। মনে মনে পরিচয় সৃষ্টি করে নিল তার।

কয়েকদিনের দুর্ভাগ্য তার অপনোদিত হল। বলা যেতে পারে— অন্য এক জনের দুর্ভাগ্য তার ভাগ্য খুলে দিল। একটি অশ্বশকট দ্রুত বেগে যাচ্ছিল—ধাক্কা মেরে একটি বৃদ্ধকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে গেল তার গম্য পথে। বালক চান্দ্রেয় স্বভাব বশতঃ দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে এল সেই বৃদ্ধের কাছে। তাঁকে তুললো ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিল তাঁর কপালের রক্ত—ডানহাতের রক্ত। বৃদ্ধ বললেন 'বেঁচে থাকে বাবা।' চান্দ্রেয় তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে এল তাঁর বাড়ি

বৃদ্ধ এক ধনী চাষী। শস্যনগরে ভাল চাষ বাস হয়। সমতল অঞ্চল অনেক বেশি। চান্দ্রেয় দক্ষিন প্রান্তের পিতৃমাতৃহীন এক দরিদ্র- ভিখারী বালক হিসাবে পরিচয় দেওয়ায় বৃদ্ধ তাকে তাঁর গৃহেই অবস্থান করতে বলে। বৃদ্ধের পুত্র তার পরিশ্রম তার বিনয় ও ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে তাকে উত্তম পরিচ্ছদ কিনে দেয়। কদিন ভাল খেতে পেয়ে চান্দ্রেয় ফিরে পায় তার শক্তি।

কিছুদিন পরেই বৃদ্ধের পুত্র তাকে সন্দেহ করতে থাকে।

মাঝে মধ্যেই টাকার হিসাব মেলেনা মাঝে মাঝেই বাড়ির এটা ওটা হারিয়ে যায়। চান্দ্রেয়র ঘরে সে কোন প্রমাণ পায়না তাই সে একদিন চান্দ্রেয়কে জানায় আমাদের গ্রামের মনিকার মহদাশয় ব্যক্তি—তুমি তাঁর বাড়িতে যদি কাজ করতে রাজী থাকো তবে আমার সঙ্গে চলো। তুমি তো বালক মাত্র—চাষ বাস কিছুই জানো না -"চান্দ্রেয় মনে মনে হাসে বলে," মনিকার অনেক ধনী মানুষ, কাজ ন পারলেই তো মারবেন।'

তবু সেই মনিকারের বাড়িতেই চলে গেল সে। মনে মনে ভাবলো, "বেশ বড় চুরিই করবো। সময় নেবো-ধৈর্য্য ধরবো।"

ঘর গৃহস্থলীর কাজ। ঝাঁট দিতে হয়, মুছতে হয় বিশাল বাড়ি। সমস্ত শিশু আর নারীদের কাছে সে পরম প্রিয় হয়ে উঠলো কদিনেই। এমন কর্মঠ এমন হাসি খুশি বালককে সকলেই ভালবাসে।

শেষে মাস তিনেক পরে গৃহিনীর অনুবোধে মনিকার তাকে বহাল করলো তার কর্মশালায়। জানালো কাজ শিখতে পারলে অনেক টাকা এখন ঘর ঝাঁট দিয়ে এককনাধুলোও বাইবে ফেলবি না—এখানকার ধুলোতেও সোনা, হীরে চুনী, পান্না।

প্রচণ্ড লোভ হলেও চান্দ্রেয় নিজেকে সংযত করে রইল চার বছর। কাজ শিখলো মনোযোগ দিয়ে। হীরে কাটার কাজ। হীরা নাকি পাওয়া যায় প্রাঞ্জল পাহাড়ে—পাথরের সঙ্গে মিশে থাকে।

সমস্ত মনিকার বাড়ির বিশ্বাস অর্জন করলো সে। বৃদ্ধ চাষীর পুত্র ভেবেছিল যে মনিকারের বাড়িতে চান্দ্রেয় ঠিক ধরা পড়বে। কিন্তু সে দেখলো—তার ভুল হয়েছে। ভাবলো চান্দ্রেয় দারিদ্রের জ্বালায় বুঝি চুরি করেছিল।

এখন চান্দ্রেয় সপ্তদশ বর্ষীয়। রাজধানীতেও যায়- নানান কাজকর্ম নিয়ে। অর্থ বয়ে আনে মনিকারের বাড়িতে।

এমন সময়ে চান্দ্রেয় জানাল, ''আমায় যেতে হবে গ্রামে মাতুলালয়ে। রাজধানীতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ। যেতেই হবে। ফিরবো তো নিশ্চয়ই। নইলে কোথায় যাবো।' এক মাসের ছুটি নিয়ে চান্দ্রেয় সকলের সামনে দিয়ে বিদায় নিল এক প্রভাতে।

দিন পনেরো পরে মনিকার বাড়িতে এসে মাথায় হাত দিয়ে জানালেন, 'চান্দ্রেয় কয়েক হাজার টাকার হীরা ও সোনার গহনা নিয়ে চলে গেছে। এমনকি ছুটি হীরা কাটা ছুরিও নিয়ে গেছে।' অনেক সন্ধান করা হল কিন্তু চান্দ্রেয়কে কোথায় পাবেন তাঁরা!

চান্দ্রেয় বন পথে এসে আর পদ্মাবতীনগরে ফেরার রাস্তা খুঁজে পায় না। পরে মনে পড়ে সেই ঝর্ণার কথা। সেই ঝর্ণা ধরে হেঁটে বহুকষ্টে পৌঁছে যায় সীমান্ত অঞ্চলে। তব সে সাহস পায় না —আকস্মিক সেখানে যেতে - মানুষ জনের সঙ্গে মিশতে।

পাহাড়ের কথা মনে পড়ে তার। হীরা পাবার লোভ জাগে মনে। যায় সে পাহাড়ের দিকে। পেয়ে যায় এক প্রাকৃতিক গুহা। সঙ্গের হীরা ও সোনার জন্য মনে ভয় জাগে।

তবু একদিন সে নেমে আসে হাটে। দেখে কেউ তাকে চিনছেনা। চেনার অবকাশই বা কোথায়! কিনলো কিছু খাদ্যদ্রব্য - কিছু লৌহনির্মিত সামগ্রী - শাবল, কুঠার, হাতুড়ি, ছেনী বাটালী সাঁড়াশি, কড়া, খুন্তি, চাটু ইত্যাদি।

রাজকুমার শংখচূড় অশ্বপৃষ্ঠে আসীন। নানা মানুষ তাঁকে

ঘিরে। লোকমুখে উচ্চারিত শব্দশ্রবণে চান্দ্রেয় বুঝে নিল। চিনে নিল শংখচূড়কে।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর বুঝলো, লৌহসামগ্রী বহনের ক্ষমতা নেই। ভাবলো একটা ঘোড়া কিনতে হবে। এখনই নয়। এখন একটা বোকাশোকা লোক চাই— যে মোট বইবে। তাকে গুহা পর্যন্ত নেওয়া যাবে না।

বুদ্ধিমত সাফল্য লাভ করলো সে। গুহার মুখটা ঢাকার ব্যবস্থা করলো সে। রাত্রে ভিতর থেকে বন্ধ করার ব্যবস্থাও করলো। চাবী তালা নেই, অথচ আছে।

এরপর থেকে সে নিয়মিত পাহাড়ে যাওয়া শুরু করে দিল। এবং সামান্য সামান্য করে বেশ কিছু অকর্ষিত হীরা, চুনী পান্না যোগাড় করল। এগুলি সে গুহামধ্যে পাথরের তলায় সঞ্চয় করে। থলিকায় রাখে না।

কিছুদিন কাজ করার পর সে বুঝলো যে, পদ্মাবর্ত নগরের সীমায় যে পাহাড় তার মধ্যে হীরাপ্রস্তর খুবই কম শংখনগর সীমায় তা প্রচুর। এখানেই সে একদিন পেল এক মহামূল্যবান হীরক প্রস্তর।

হাটে তাকে সপ্তাহে একদিন আসতেই হয়। আহার্য্যের জন্য। ফলে একটা অশ্ব তাকে ক্রয় করতেই হল। হাটের লোক তাকে জানে বেশ ধনী বলে। মাঝে মাঝে সে স্বর্ণমুদ্রা ভাঙিয়ে নেয় বাজারে। কিন্তু কেউ জানে না তার পরিচয়।

এই ব্যাপারটা কানে ওঠে শংখচূড়ের। সে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। সে হাটবারে তার সাক্ষাৎ চায়। চান্দ্রেয়ও তার সাক্ষাৎ চায়। কেননা সে সেই মুল্যবান হীরক প্রস্তর খণ্ডটী শংখচূড়কে দান করতে চায়। কেননা লোকমুখে সে তার মায়ের সংবাদ

পেয়েছে—মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পেতে হলে শংখচূড়কে সম্মত করাতেই হবে। এছাড়াও সে দেখেছে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ফিরে দেখছে-সীমান্তপ্রদেশে বিদ্যালয় হয়েছে, নন্দিনীনদীর সংস্কার করিয়ে চাষ বাসের ব্যবস্থা হয়েছে—মানুষজন সবদাই শংখচূড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

উভয়ের প্রতীক্ষিত হাটবার এসে গেল। শংখচূড় চান্দ্রেয়র সংবাদ নিতে বলে দিল তার প্রহরীদের। চান্দ্রেয় দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে গেল। "প্রণাম যুবরাজ" বললো।

যুবরাজ প্রশ্ন করলো, কে তুমি? কিবা তব পরিচয়? চান্দ্রেয় যুক্তকরেই বললো, যুবরাজ—আমি সেই পুরাতন তস্কর চান্দ্রেয়।" যুবরাজ ভ্রূকুটি করে বললো। "তস্কর চান্দ্রেয়? এমন ভাবে কেউ আত্মপরিচয় দেয় না—সত্যভাষণ করো।"

চান্দ্রেয় তখন বললো, আমার তো অন্য কোন পরিচয় আজও এরাজ্যে নেই যুবরাজ। আমি এখানকার শোধনাগার থেকে পালিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলে যাই শংখরাজ্যে। সেখানেও চৌর্য্যই ছিল আমার বৃত্তি। অবশ্য কখনও ধৃত হইনি। তারপর এক মনিকারের বাড়ি থেকে বেশ কিছু অর্থসংগ্রহ করে স্বদেশে ফিরে এসেছি। জন্মভূমিকে ভোলা যায়না। ভোলাযায়না জন্মদাত্রী মাকে।"

যুবরাজ বললো, তোমায় সত্যবাচনে আমি পুলকিত। তবু এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার পিতামাতার ঠিকানা দাও। চান্দ্রেয় সব জানালো।

এতক্ষনে যুবরাজের খাজাঞ্চি চান্দ্রেয় সম্বন্ধে কাগজ পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, না যুবরাজ লোকটি ঠিকই বলেছে।

চৌর্য অপরাধে চান্দ্রেয় নির্বাসিত হয় তার মাতা স্বয়ং তাকে ধরিয়ে দেন। মহারাজ তাকে এই রাজ্যে শোধনাগারে পাঠান। সে পালায়।

যুবরাজ বললো, তাহলে চান্দ্রেয় বর্তমানে তুমি কী করছ? এই অরণ্য বা পাহাড়ে তো চৌর্য্যবৃত্তি চলেনা। হাসলো। চান্দ্রেয়ও হাসলো, "যুবরাজ এখনও চৌর্য্যই বৃত্তি আমার— সকলেই অবাক। চান্দ্রেয় বললো, "প্রাঞ্জল পাহাড়ে পাওয়া যায় নানাবিধ রত্ন— তার বেশির ভাগই আছে শংখনগর সীমানায়— আমি তাই সংগ্রহ করি যুবরাজ এই দেখুন— বলে হীরক প্রস্তরটী বার করে দেখিয়ে বললো, এটা দুর্লভ রত্ন বিশেষ এটী আপনি গ্রহণ করুন—আমার অপরাধ মার্জনা করুন এবং আমার সাথে আমার মায়ের সাক্ষাতের সুবিধা করুন।

শংখচূড় রত্নাদি ভাল না বুঝলেও ওজনে বুঝে নিল হীরকটি মূল্যবানই। বললো, এর মূল্য দেবার সামর্থ্য আমার নেই ভাই। বলে ফিরিয়ে দিতে গেল। চান্দ্রেয় বললো, এটী তো প্রণামী এই অভাগা চান্দ্রেয়র প্রণামী। আপনি দয়া করুন। এটী গ্রহণ করুন। এই হীরক আপনার সৌভাগ্য এনে দেবে, যুদ্ধে অজেয় করবে। এ হীরকটি চিক্কণ করিয়ে আপনি পরবেন, সবদা পরে থাকবেন।

যুবরাজ বললো, "এ তুমি রাজাকে দাও।" চান্দ্রেয় বললো, না যুবরাজ তাঁকে দেবার জন্য অন্য অনেক হীরকপ্রস্তর আছে। যুবরাজ বললো, অনেক হীরক প্রস্তর? চান্দ্রেয় বললো "হ্যাঁ, যুবরাজ—কিন্তু সঙ্গে নাই।"

খাজাঞ্চি বললেন, তুমি কিছু অর্থ তোমার পিতার নামে দান কর। মহারাজকে জানাও শঙ্খনগরের সম্পদ লুঠ করেছ

তাহলেই মাতৃদর্শন পাবে।

চান্দ্রেয় খাজাঞ্চির কাছে এসে প্রশ্ন করলো ,'মা কেমন আছে? কী করছে? খাজাঞ্চি বললেন, ঠিক মতো জানিনা, তবে ধরিয়ে দেবার পুরস্কার হিসাবে রাজা মহাশয় তাঁকে তাঁর অন্নসত্রে চাকুরী দিয়েছেন বলে জানি।

চান্দ্রেয়র চোখে জল এল, বললো, মাতা এখনও দাসীবৃত্তি করছে—আর আমি এখানে আনন্দ করছি—যুবরাজ আপনি আমায় হত্যা করুন। এই সম্পদ আমার মাকে দিন—তাঁকে মুক্ত করুন যুবরাজ।

শংখচূড় তাকে আলিঙ্গন করে বললো, অধীর হয়োনা চান্দ্রেয়। কয়েকদিন ধৈর্য্য ধরো আজ তুমি যাও—তোমায় আমি ঠিক খুঁজে নেবো—সে সময় একান্তে কথা হবে।

চান্দ্রেয় হাসলো, বললো, জয় হোক যুবরাজের। চলে গেল সে। মনে মনে ভাবলো, হাট ছাড়া অন্যত্র আমায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শঙ্খচূড় রাজধানীতে ফিরল দ্রুত অশ্বচলনা করে। শ্রেষ্ঠ মনিকারকে দিল সে হীরকপ্রস্তর। তিনি চমকে উঠে বললেন, এ রত্ন কোথায় পেলেন যুবরাজ এ.তো বৈদূর্যমনি। শঙ্খচূড় বললো, 'এ হলো হিমালয়ের দান—আমার এক পরম ভক্ত দিয়েছে।" মনিকার বললেন এ মনি ধারণ করলে যশশ্রী হওয়া যায়—যুদ্ধে অপরাজেয় হওয়া যায়। যুবরাজ, এ জিনিস হাতে পেয়ে কেউ কাউকে দিতে চায়না—এ বস্তু তুমি পেয়েছ পরমভাগ্যে—ধারণ করো সর্বক্ষণ।

শঙ্খচূড় বুঝলো, "চান্দ্রেয় সত্যভাষী। চান্দ্রেয় সত্যই পাথর চেনে।" রাজবাড়িতে ফিরে রাজাকে চান্দ্রেয়র প্রার্থনা

জানাল। রাজা বললেন, সপ্তাহে একদিন মাত্র সে তার মাকে দেখতে আসতে পারবে। শহরে তাকে থাকতে দিতে পারিনা কেননা সে তস্করতা ত্যাগ করেনি।

চান্দ্রেয় মায়ের পা ধুইয়ে দিল চোখের জলে। অনেক স্বর্নালঙ্কার দিতে গেল। মা ছুড়ে ফেলে বললেন সেই চুরির জিনিস দিচ্ছিস তুই—এ আমি নিতে পারিনা। পরিশ্রম করে যদি কিছু উপার্জন করে আনিস, তবে নেবো তোর টাকা। চান্দ্রেয় মাথা নীচু করে ফিরে এল।

একদিন দ্বিপ্রহরে গুহায় ফিরে দেখে দুয়ারে সুসজ্জিত অশ্ব। চমকিত চিত্তে তাকিয়ে দেখল শঙ্খচূড়! "যুবরাজ" বলে করজোড়ে প্রণাম জানাল। শঙ্খচূড় বললো, 'ঠিক খুঁজে নিতে পেরেছি তোমার গুহা।" চান্দ্রেয় বললো, হ্যাঁ যুবরাজ ভেবেছিলাম আপনি পারবেননা। আপনার অসাধ্য কী আছে ?

যুবরাজ দেখালো তার বৈদুর্য্যমনি—বললো, চান্দ্রেয় এটি পরিধানের পরই আমার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। চান্দ্রেয় বললে "যুবরাজ বলেছিলাম—" শংখচূড় বললো, তুমি ঠিক বলেছিলে তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ—শংখনগর আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে পারে বলে সংবাদ আছে চান্দ্রেয় তুমি কোন পথে শংখনগর থেকে পলায়ন করেছ—তা তোমার স্মরণে আছে ?

চান্দ্রেয় বললো, না যুবরাজ তখন তো প্রাণভয়ে ভীত হরিনীর মত ছুটেছি তবে পাহাড় পেরিয়েছি বলে মনে আছে। চান্দ্রেয়কে দ্বিধান্বিত দেখে যুবরাজের মনে সন্দেহ হল। বললো "চান্দ্রেয় যদি জানো, সত্য বলো! দেশের স্বার্থে তা তোমার বলা উচিত।"

চান্দ্রেয় বললো, চেষ্টা করবো মনে করতে—আমায় কয়েক-দিন সময় দিন। যুবরাজ প্রসংগ পাল্টে বললো, মকে আর

দেশে.ত যাচ্ছনা চান্দ্রেয়। চান্দ্রেয় মায়ের সেই কাঠিন্যের কথা খুলে বললো যুবরাজকে।

শংখচূড় বললো, চান্দ্রেয় তুমি আমার দেহরক্ষীর চাকুরী গ্রহণ কর। সেই বেতন তোমার মাকে দাও তিনি নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করবেন। চান্দ্রেয় বললো, আমি তো অস্ত্র ব্যবহার জানিনা। শংখচূড় বললো, চৌর্যবৃত্তিতে তোমার যা সাধনা, সেই সাধনার সামান্য এক অংশই পাবে তোমায় অস্ত্রবিদ্ করতে। চান্দ্রেয় বললো, "যুবরাজ, শুনেছি এ বৎসর সারা ভারতের অস্ত্রপরীক্ষায় আপনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন? শংখচূড় বললো, হ্যা এটা সত্য। তবে নিজের জয়ে আমি সন্তুষ্ট নই কেননা মগধিরাজ দেবেন্দ্রর পুত্র প্রদ্যুম্ন অসুস্থ এবং আহত হওয়ার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। অসিযুদ্ধ আর ভল্লানিক্ষেপ আমিই শ্রেষ্ঠ এটা মানা যায়। কিন্তু সব বিষয়ে মিলিত ভাবে তিনিই শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি।

চান্দ্রেয় বললো, যুবরাজ আপনি যদি শিক্ষা দেন তবে আমি সৈনিক হতে পারি তবে নিজ পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করতে পারি— তবে মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারি। ফিরে পেতে পারি আমার পরিচয় মুছে ফেলতে পারি তস্কর চান্দ্রেয় নাম।

ছয়মাস শিক্ষার পর চান্দ্রেয় পেল সৈনিকের কাজ। শংখচূড়ের দেহরক্ষী। এতদিন এইরূপ কোন পদ ছিল না— কেননা শংখচূড়ের দেহরক্ষী থাকার দরকার ছিল না।

চান্দ্রেয় তার চৌর্যসম্পদ রাজকোষে জমা দিয়েছে—কেবল প্রাণেধরে অকর্ষিত হীরক প্রস্তরগুলো আর হীরক কাটা ছুরিকা দুটি দেয় নাই। অকর্ষিত হীরকগুলি তো তার চৌর্যসম্পদ

নয়। অবসর সময়ে বসে বসে সেইকাজ করে—হীরকখণ্ডের কেটে এবং মসৃন করে রেখে দেয় আপন সঞ্চয়ে।

এখন সে প্রতি সপ্তাহে মাকে দেখতে যায়। দ্রুত অশ্বধাবন করতে পারে ভালো অসিচালনা করতে পারে। রাজানগেন্দ্র তার পরিবর্তনে খুব খুশি। রানী সুপ্রভা তাকে বলেছেন, শংখকে ছায়ার মত অনুসরণ করবে। তাকে বাঁচাতে জীবন পর্যন্ত দিতে হবে চান্দ্রেয়। চান্দ্রেয় করজোড়ে বলেছে নিশ্চয় রানীমাতা—তিনিই তো আমায় নবজীবন দান করেছেন তার মূল্য আমি চুকিয়ে দিতে প্রানপন করবো।

রানী সুপ্রভা বললেন, "চান্দ্রেয়- তুমি তস্কর ছিলে তাই তুমি স্বাভাবিকভাবে ধূর্ত তোমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সজাগ রেখো— শংখনগড় আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে পারে বলে সংবাদ আছে। সাবধান যুবরাজের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

চান্দ্রেয় রানীমাকে প্রণাম করে ফিরে এল সীমান্ত অঞ্চলে। যুবরাজকে বুঝিয়ে থাকতে শুরু করে দিল তার পুরাতন গুহায়—একাকী সঙ্গীহীন। জানাল, "যুবরাজ, আপনি দীর্ঘদেহী, বীর আপনার পক্ষে শংখনগরের সংবাদ আহরণ সম্ভব নয়। এর জন্য চাই গুপ্তচর। আমি একাকী এক দিবসে দেখে আসব কী প্রস্তুতি চলছে শংখনগরে।"

যুবরাজ বললো, "চান্দ্রেয় গুপ্তচর বৃত্তিও তো চৌর্যাবৃত্তি আমি চাই সামনা সামনি লড়তে।" চান্দ্রেয় হাসলো বললো, যুবরাজ আপনি বীর রনাংগনে আপনি অজেয় যোদ্ধা কিন্তু যুদ্ধ তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়—সেখানে নানা অসুবিধা বহু মানুষের ধননাশ প্রাণনাশ হতে পারে। তাছাড়া রানীমা বলেছেন গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করতে বলেছেন দেশের জন্য চৌর্য্যবৃত্তি

বীরত্বেরই নামান্তর। তাই যুবরাজ আমায় ছুটি দিন কয়েকদিবসের জন্য। আমি যথাশীঘ্র ফিরে আসব। এই কয় দিবস আপনি সাবধানে থাকবেন।"

যুবরাজ তাকে ছুটি দিল সহাস্য মুখেই। কিন্তু আসলে ঠিক করল চান্দেয়কে অনুসরণ করতে হবে। তাই চান্দেয়র অজানিতে রয়ে গেল অন্য এক গুহামধ্যে।

পর প্রভাতে দেখলো চান্দ্রেয় ঘন বন মধ্যে প্রবেশ করছে। শংখচূড় নির্ভীক যোদ্ধা ফলতঃ সেই অন্ধ-বনমধ্যে প্রবেশে ভয় পেল না। বহুকষ্টে চান্দ্রেয়কে দূর থেকে অনুসরণ করতে করতে চলে এল এক ঝর্ণার নিকট। সামান্য আলোর ঝিলিক সেখানে, দেখল, চান্দ্রেয় জলপান করছে।

চান্দ্রেয় আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে নামতে থাকল। হ্রদতীরে এসে থামলো-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো আশে পাশে। দেখতে পেল-এক সৈনিক এক মহীরুহের পাশে লুকিয়ে আছে। সাবধানে চান্দ্রেয় তস্করের মত আলতো পায়ে শব্দ না করে পৌঁছে গেল সৈনিকের পিছনে। একটি বড় পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো। সৈনিকটি নিঃশব্দে পড়ে গেল। চান্দ্রেয় দ্রুত হাতে সৈনিকের পকেট খুজলো। সামান্য কয়েকটী মুদ্রা ছাড়া কিছু পেল না।

ভাবলো কেন এই সৈনিক-হ্রদতীরে কী লক্ষ্য করছিল সে? সৈনিকের উষ্ণীষটি মাথায় দিয়ে সে মহীরুহের নিকট গিয়ে দেখল একাকিনী একটি নারী-অপরূপ সুন্দরী যুবতী তীরবর্তী কাননের পুষ্পবনে বিচরণ করছেন!

মনে পড়ল শঙ্খনগরের রাজকন্যার কথা। তিনি অস্ত্রচর্চা করেন-তার নারীবাহিনীও আছে। অতএব এই প্রহরীটি

তাঁকে রক্ষা করছিল না। তাহলে কী কেউ রাজকন্যাকে অপহরণ করতে চাইছে। তাহলে কী করি? একাকী কী করতে পারি।

রাজকন্যাকে আমিই চুরি করতে পারি—শঙ্খনগরের রাজা তাহলে পদ্মাবতী নগরকে অনেক টাকা দিতে বাধ্য থাকবে।

শঙ্খচূড় পশ্চাতে থেকে চান্দ্রেয়র সৈনিক হত্যার কৌশলে অবাক-এত সহজে একজন মানুষকে হত্যা করা যায়'? অবশ্য উপায় তো নাই—যুদ্ধে তো মারো নয়তো মরো।

চান্দ্রেয় ধীরে অথচ দৃঢ় পায়ে রাজকন্যার নিকটবর্ত্তী হতে থাকলো। শঙ্খ তার সামান্য পশ্চাতেই। যত নিকটে যায় চান্দ্রেয় তত নিশ্চিত হয় রাজকন্যা অপালা'ই রয়েছেন কাননমধ্যে।

এমন সময় নয়জন অশ্বারোহী রাজকন্যাকে ঘিরে ধরলো। তাদের মাথায় চান্দ্রেয়র মত উষ্ণীষ। চান্দ্রেয় বুঝলো, এই উষ্ণীষ ধারীরা রাজকন্যাকে অপরহণ করতে চাইছে। কী করবে ভাবছে-দেখলো, দুজন তীর বিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়লো। পিছনে তাকিয়ে দেখলো যুবরাজ-ধনু হাতে তীর ছুঁড়ছেন। উষ্ণীষ ধারীদের দলপতি বলল, "আক্রমন করো এই বিদেশীকে।"
চান্দ্রেয় বীথিকার মধ্য দিয়ে লুকিয়ে চলতে থাকল দলপতির কাছে।

অন্যদিকে শঙ্খচূড় তীরের সাহায্যে আরো দুজনকে ভূ পাতিত করেছে। বাকী চারজন তরবারি নিয়ে শংখচূড়ের দিকে ধাবমান রাজকন্যা শৃংখলিতা-শায়িতা। দলপতি গর্জন করছে-'ঘিরে ধরো।'

চান্দ্রেয় আকস্মিক পিছন থেকে দলপতির কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ধরে বললো 'এখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে বলো -নইলে তোমার গলা কেটে ফেলবো।"

দলপতি হাত তুলে বললো, "থামো-যুদ্ধ থামাও।" শংখচূড় অন্য সৈনিকদের তরবারি এবং অন্যঅস্ত্র কেড়ে নিয়ে

রাজকন্যার পদতলে জমা করলো। দলপতির সামনে এসে বললো "আরে সেনাপতিপুত্র অহিনক যে।" তার অস্ত্র কেড়ে নিল। চান্দ্রেয়কে বললো, "চান্দ্রেয়-বন্দিনীর শৃংখল মুক্ত কর।"

চান্দ্রেয় বললো "যুবরাজ শঙ্খচূড়-ইনিই রাজকন্যা অপালা।"

শংখচূড় বললো।" "অভিবাদন গ্রহন করুন রাজকন্যা। চান্দ্রেয় অহিনককে বন্দী করো। তাকে নিয়ে চল আমাদের রাজ্যে। মুক্তিপন পাবো।"

চান্দ্রেয় বললো, রাজকন্যা অপালার জন্য আরো বেশি পাওয়া যাবে যুবরাজ।'

শংখচূড বললে, "ছি-নারীকে রক্ষা করাই বীরের কাজ। আমি ভেবেছিলাম, তুমি তাকেই রক্ষা করতে আসছ-তাই অগ্রসর হলাম।"

চান্দ্রেয় অহিনকের বন্ধন সমাপ্ত করলো। দেখলো, অন্য চারজন সৈনিক পলায়নে তৎপর। বললো, 'যুবরাজ, হত্যা করুন।" শংখচূড় বললো, "পলায়নকারীকে আমি হত্যা করি না-নতুবা এই অহিনককে আমি আগেই হত্যা করতাম। মহারাজ কুমার প্রদ্যুম্নকে এই অহিনকই হঠাৎ আঘাত করে আহত করে পালাচ্ছিল।"

বন্দী অহিনক বললো "সেই ভল্ল ছিল তোরই উদ্দেশ্যে। এখন আর তোরা এই রাজ্য থেকে পালাতে পারবি না। ওই দ্যাখ রাজকন্যার নারীবাহিনী আসছে।"

চান্দ্রেয় বললো. "কেউ আমাদের বন্দী করতে পারবে না।" রাজকন্যার কাছে গিয়ে বললো "দিদি আমরা তো আপনাকে বাঁচাতেই এসেছিলাম- আপনি কী ধরিয়ে দেবেন আমাদের?

অপালা হাসলো, বললো, "না ভ্রাতা, এই অহিনকের

হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছ বলে-এই নাও তোমার পুরস্কার।" ব'লে তাঁর কটিবন্ধ হতে তরবারিটী দিলো চান্দ্রেয়কে।

শংখচূড় বললো, "রাজকুমারী বিদায় দিন। অহিনককে সঙ্গে নিয়ে চলি।" অপালা বললো, "তা হয় না যুবরাজ। আমার প্রজার বিচার আমরাই করবো।"

রক্ষীনেত্রী অশ্ব থেকে নেমে প্রশ্ন করলো, 'একী ব্যাপার' অপালা সব ঘটনা বললো। তারপর আদেশ দিল, 'অহিনককে বন্দী করাই আছে-এই দুই বিদেশীই আমায় রক্ষা করেছেন-তাই এদের চলে যেতে দাও।'

অহিনক বললো, 'আমায় রক্ষা করো দলনেত্রী—যুবরানী'র গোপন প্রণয় লীলায় ব্যাঘাত ঘটানোয় এরা তিনজনে আমায় বন্দী করেছে। তুমিই আমাদের বিচার সভায় নিয়ে চল-সেখানে রাজামহাশয়ই বিচার করবেন। বিশেষতঃ এই যুবক হচ্ছে শংখ-নগরের যুবরাজকুমার শংখচূড়।'

শংখচূড় বললো, 'জাগ্রত অবস্থায় জীবন্ত আমাকে বন্দী করা যায় না। আমরা চলে যাব। দলনেত্রী আপনার সৈন্যদের সংযত থাকতে বলে দিন।'

চান্দ্রেয় বললো, 'দলনেত্রী আপনাদের রাজকন্যার দিকে দেখুন।' দলনেত্রী দেখল রাজকন্যার কণ্ঠদেশে তরবারি ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চান্দ্রেয়। চান্দ্রেয় বললো 'যুবরাজ, অহিনককে নিয়ে আপনি অগ্রসর হোন আমি রাজকন্যাকে নিয়ে যাচ্ছি—' বলে রাজকন্যাকে বললো, 'দিদি চলতে থাকুন-এছাড়া অন্য পথ নেই।'

অপালা বললো, "পিতাকে সংবাদ দাও।" চান্দ্রেয় বললো। "অহিনকের মুণ্ড পাঠিয়ে দেব সময় মতো। রাজকন্যার জন্য চিন্তা করো না—তাঁহাকে সময় মত এইখানে রেখে যাব।"

শংখচূড় বললো, "এইখানে পাঁচটি মৃতদেহ আছে-এরা সব

এই অহিনকের সহচর। এ ছাড়া উপায় ছিল না দলনেত্রী -স্বরাজ্যে ফিরে রাজকন্যাকে সগৌরবে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলাম।"

অসহায় দলনেত্রীর চোখের সামনে দিয়ে রাজকন্যা অপালা আর দুষ্ট অহিনককে নিয়ে চলে গেল পদ্মাবতীনগরের যুবক।

ঘন অন্ধকার বনমধ্যে চান্দ্রেয় মশাল জ্বালালো। ঝর্ণার নিকট এসে বললো, যুবরাজ-এই দুষ্ট অহিনককে অযথা সঙ্গে নেবার কোন প্রয়োজন নেই। এখানেই গাছে বেঁধে রেখে যাই- বন্যজন্তুরা ভক্ষণ করুক। চক্ষু বন্ধন করে বার কয়েক ঘুরিয়ে দিলে দিক ভ্রম হয়ে যাবে – অন্ধকারে পথ চিনে পালাতে পারবে না।

অপালা বললো "ওকে শংখনগরেই পাঠানো উচিত ছিল। মাথায় ওর দুষ্ট বুদ্ধি সর্বদাই জাগ্রত। আমাকে বিবাহ প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এর আগেও একবার আমায় চুরি করতে চেষ্টা করেছিল-সেবার দলনেত্রী সজাগ ছিল – পিতাকে আমি তা জ নিয়ে রেখেছি-ফলতঃ সে কঠিন শাস্তি পেতই।"

অহিনক বাঁচার চেষ্টায় বুদ্ধি শানাচ্ছিল তাই জবাব দিল না। শংখচূড় বললো "চান্দ্রেয়. এই অভিযানের নেতা তুমি, তোমার নির্দেশ মতই চলছি। এখন সঠিক সিদ্ধান্ত জানাও পদ্মাবতী নগরের সীমান্তে পৌঁছাবার পর আমি যুবরাজের কর্তব্য পালন করবো।"

চান্দ্রেয় বললো, "ধিক আমাকে, আপনাকে আঘাত করেছি। আপনি যদি না চান-অহিনককে এখানে রেখে বসুন-আমি ভগিনী অপালাকে তাঁর হ্রদতীরে রেখে কাল প্রভাতেই ফিরে আসবো। যুবরাজ, রানীমা বলেছিলেন 'যুদ্ধে সব কিছু চলে,' আমি ভেবে দেখলাম যুদ্ধ থামাবার সুযোগ আমার সামনে। আপনি বলেছেন

-এখন আমি নেতা-তাই বলি, ভগিনী অপালাকে বন্দী করিনি -তাকে নিয়ে যেতে চাই—যুবরানী করতে চাই—তাহলেই ত্বদেশের মধ্যে যুদ্ধ থেমে যাবে। —এ বিষয়ে আপনারা-তুজনেই আমার নিকট শ্রদ্ধেয়-তুজনে ভাবুন-আপনারা কেহ কারোর পক্ষে অনুপযুক্ত নন-রাজকন্যা অপালা আপনার বীরত্বে মুগ্ধ আপনি ত র আচরণে ন্যায়নিষ্ঠতায়, রূপে মুগ্ধ-তাই আমার বিনীত অনুরোধ-এই বিবাহ প্রস্তাব মেনে নিয়ে তুই দেশের এতবড় সর্বনাশ হতে দেশকে বাঁচান।'

শংখচূড় নীরব। এ কথার জবাব নেই। অহিনক বললে। ''ওহে গর্দভ তুমি তো জানোই না যে এটি এদের প্রথম সাক্ষাৎ নয়।'' অপালা বললো, ''মিথ্যা ভাষনে ভাই চান্দ্রেয়কে বিভ্রান্ত করা যাবে না। তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই আজ সফল হয়েছে। চান্দ্রেয়-আমি তো স্বেচ্ছাবন্দিনী-আমার অস্ত্রেই তুমি আমায় বন্দী করেছ—অন্যথায় আমার প্রতিজ্ঞারক্ষা হতো না। অহিনক, হিংসায় তুমি জ্বলে যাচ্ছ জানি—তবু শোনো ইন্দ্রপ্রস্থে মুখে বললেও রাজকুমার শংখচূড়ের সাথে সাক্ষাৎ করিনি। স্বীকার করছি— তাঁর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা হয়েছিল প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে। যুবরাজ সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে আমি প্রথম হতে পারিনি। তবু আপনাকে অভিনন্দন জানাবার প্রস্তাব করি। তখন এই তুষ্ট অহিনক আমায় পদ্মাবতীনগর সম্বন্ধে যাতা অপভাষা বলে।''

অহিনক বলে, ''যুবরাজ শংখচূড়, আপনি আমার ওপর ক্রোধান্বিত জানি। তবু বলি কী আমায় মুক্তি দিন—আমি শংখনগরে মহারাজকে আপনাদের বিবাহের কথা বলে তুইরাজ্যের সখ্যতা আনয়নে সাহায্য করবো। এই আনন্দের ক্ষণে আমায় মুক্তি দিন।''

চান্দ্রেয় বলে, 'অহিনক ভুলে যেওনা আমি তস্কর চান্দ্রেয়। তোমার চালাকি, তোমার বিনয়ের কারণ অনুমান করছি। চলো, আমাদের রাজ্যে অথবা এখানে বন্দী অবস্থায় থাকো।'

অহিনক বলে, 'না বন্দী করে বন্যপশুর আশ্রয়ে রেখে যেওনা—আমায় বাঁচতে দাও।' 'তবে চল।' বলে চান্দ্রেয় আবার হাঁটা দিল। সীমান্তশহরে পৌঁছাতেই বিপুল জনসমাবেশ রাজকুমার শংখচূড় এবং চান্দ্রেয়কে পাওয়া যাচ্ছে না বলে সকলেই উৎকণ্ঠিত। রাজধানীতে সংবাদ চলে গেছে। বৃদ্ধ খাজাঞ্চী মশায় এসে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন, বললেন, 'ভয়ে সংবাদ পাঠিয়েছি রাজধানীতে।'

চান্দ্রেয় তাঁকে আড়ালে ডেকে জানাল, রাজকন্যা অপালা আর সেনাপতি পুত্রকে বন্দী করে এনেছি। খাজাঞ্চি বললেন, তারা কোথায়? চান্দ্রেয় বললো, দুষ্ট অহিনককে বন্দী করে রেখেছি আমার গুহায়। রাজকন্যা অপালা আছেন যুবরাজের অবরোধের অতিথি গৃহে। আপনি অনুমতি দিলে দুজনের বিবাহ দিয়ে দিতে পারি।

খাজাঞ্চি বললেন "রাজামশাই এবং রানীমা আসছেন—আগামী কাল তাঁদের বলো। চান্দ্রেয় বললো আপনি বৃদ্ধ। বহুদিন রাজকার্যে আছেন আপনার পরামর্শে রাজা মশাই কর্ণপাত করতে পারেন—আমার মত তস্করের কথায় রেগে যাবেন। খাজাঞ্চি হাসলেন।

পরদিবসে রাজা নগেন্দ্রশংকর রানীসুপ্রভা এবং তার পুত্র চন্দ্রচূড় এসে গেলো। উঠলেন যুবরাজের অবরোধে। চান্দ্রেয় চতুর এবং শংখচূড়ের সম্মতিতে রাজকন্যা অপালাকে সরিয়ে ফেলা হল।

রাজা সব শুনলেন খাজাঞ্চির মুখে। রাজকন্যা এবং সেনাপতিপুত্রকে বন্দী করে এনেছে বলে শংখচূড় আর চান্দ্রেয়কে প্রশংসা করলেন, আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু যেই বিবাহ মাধ্যমে সন্ধিস্থাপনের কথা বললেন খাজাঞ্চি, অমনি রাজা গেলেন রেগে। 'শঙ্খনগরের কন্যা চাই না—সে বন্দিনীই থাকবে-তার বিনিময়ে অজস্র অর্থ পাওয়া যাবে। অহিনকের বিনিময়েও তাই, পাহারা দ্বিগুণ করে দাও।'

শঙ্খচূড় নীরবে চলে গেল। চান্দ্রেয় চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে ভাব জমালো। তারপর তাকে পাহাড় দেখাবার নাম করে নিয়ে গেল অপালার কাছে। অপালা চন্দ্রচূড়কে পেয়ে খুশি হল। চান্দ্রেয় ফিরল একা। চন্দ্রচূড় কিছুতেই আসবে না অপালা'কে ছেড়ে চান্দ্রেয় তাকে বুঝিয়েছে 'তুমি তো দাদার কাছে বায়না করতে দাদা বৌদি এনে দাও। এবারে দ'দা তোমার বৌদি এনেছেন।' চন্দ্রচূড় তো বৌদিকে ছাড়বেই না।

চান্দ্রেয় গেল রানীমার কাছে। তাকে একা দেখে সুপ্রভা হাসলেন, 'দাদাকে ছাড়েনি বুঝি?' চান্দ্রেয় বললো, 'রানীমা আপনার নির্দেশ মতই চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করিনি—এনেছি শঙ্খনগরের স'চেয়ে দামী রত্ন,—রাজকন্যা অপালা দিদিকে। এনেছি তো শঙ্খদাদার জন্যই আপনি রাজামশাইকে বোঝান-এতে দু দেশের হাজারো মানুষের ভালো হবে। তস্কর চান্দ্রেয়র নাম আর তস্কর চান্দ্রেয় থাকবে না। মনে মনে জানবো যে জীবনে অন্ততঃ একটা কাজও ভাল করেছি মা।'

রানী হাসলেন, বললেন, 'সব কথা খুলে বলো চান্দ্রেয়।' চান্দ্রেয় বললো চন্দ্রচূড় আছে বর্তমানে অপালার কাছে। স্বেচ্ছা-বন্দিনী হয়ে এসেছেন। যদি আপনারা তাঁর জন্য তাঁর বিনিময়ে

কিছু দাবী করেন তবে আবার আমি তাঁকে চুরি করে ফিরিয়ে দিয়ে আসব তার পিতার কাছে-তাতে আমার প্রাণ যায় তা'ও স্বীকার।'

রানী প্রশ্ন করলেন, "শঙ্খচূড় কী বলছে ?" তিনি বলেছেন, পিতা মাতার আশীর্বাদ পেলে তবেই গ্রহণ করতে পারবেন রাজকন্যা অপালাকে।' রানী বললেন আমাকে দেখাও চান্দ্রেয়।' চান্দ্রেয় তৎক্ষণাৎ রাজী।

অনেক প্রহরী নিয়ে রানী এলেন চান্দ্রেয়র সঙ্গে। অপালা পদস্পর্শ করে প্রণাম করল। কথাবার্তা চলতে থাকল দুজনের মধ্যে। চন্দ্রচূড়ও থেকে গেল সেখানে সে অপালার ক্রোড়মধ্যে দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকল।

রানী বেরিয়ে এসে চান্দ্রেয়কে বললেন, এই প্রহরীরা এখন থেকে পাহারা দেবে চান্দ্রেয় তুমি প্রবেশ করবে না। মনে রেখো সে বন্দিনী।

চান্দ্রেয় মাথানীচু করে ফিরে গেল-শঙ্খচূড়ের কাছে। বললো তস্করের চাইতে শঠ হচ্ছেন রাজারা। আমরা পেট ভরাতে চুরি করি। এরা করেন বাটপাড়ি। আমি আনলাম চুরি করে-রানীমা করলেন তাঁকে বন্দিনী। যুবরাজ এই নিন আপনার পোষাক, তলোয়ার। আমায় মুক্তি দিন আমি ফিরে যাবো আবার চৌর্য্যবৃত্তিতে। এই রাজকার্যের মত হীন নয় সে কাজ।

শঙ্খচূড় বললো, ধৈর্য্য ধরো চান্দেয়-বুদ্ধি করো-তাঁকে মুক্তি দাও, নারীকে রক্ষা করাই বীরত্বের কাজ। ফেলে পালায়ণ করতে পারবো না। আমিও তোমার দলে আছি, আমি যোদ্ধা-সামনাসামনি লড়তে চাই! এই হীনতাকে আমি প্রশ্রয় দেব না চান্দ্রেয়। আজ রাতেই বন্দী বদল করবো। অহিনককে এখানে

বেধে রাজকন্যাকে তোমার গুহায় রেখে দেব।

চান্দ্রেয় বললো কেমন করে তা সম্ভব যুবরাজ শঙ্খচূড় বললো প্রহরীরা তো এই রাজ্যের লোক তারা আমায় ভালবাসে। তারা আমার জন্য একাজ করবে। তুমি বলবে যে এই চৌর্যাবৃত্তি তোমার। বলবে যে রাজকন্যাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ তাঁর রাজ্যে।

পরপ্রভাতে প্রহরীরা এসে রানীকে সংবাদ দিল বন্দিনী রাজকন্যা এক পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে।' চন্দ্রচূড় খুব কাঁদতে থাকলো। রানী অবাক হয়ে গেলেন সেই গৃহে। দেখলেন অহিনককে। এক দেওয়ালে লেখা 'রাজকন্যা অপালাকে নিয়ে গেলাম চান্দ্রেয়।

চান্দ্রেয়কে সারাদিন পরে পাওয়া গেল রাজধানীর রাস্তায়। বন্দী হয়ে নীত হল সে রাজদরবারে। রাজা নগেন্দ্র শংকর বললেন, রাজকন্যা অপালা কোথায়? 'তাঁর রাজ্যের বনসীমায় তাঁকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি— তিনি ছিলেন স্বেচ্ছা-বন্দিনী তিনি চেয়েছিলেন তাঁর আবদারে দুই রাজ্যের বিবাদ মেটাতে তার পরিবর্তে তিনি বন্দিনী হওয়ায় তাঁকে আমি চুরি করেছি। এই গৃহ আমার—তার গোপন পথে আসা যাওয়ার দরজা আছে। আপনি আমায় দণ্ড দিতে পারেন এই সব প্রহরীদের কোন দোষ নেই এদের ছেড়ে দিন।'

রাজা নগেন্দ্র বললেন যদি প্রাণদণ্ড দিই? চান্দ্রেয় হাঁটু মুড়ে বসে বললো তাই দিন মহারাজ। এই হীনতার মধ্যে বাঁচতে চাই না। যখন চোর ছিলাম তখনও নিজেকে অত হীন মনে হয়নি। এখন দেশের মঙ্গলের জন্য চুরি করে আনলাম- কিন্তু আপনারা তার মূল্য দিলেন না? শঙ্খনগরের মানুষও তো মানুষ-তাদের সঙ্গে আমাদের মত মানুষের কিসের শত্রুতা।

রানী সুপ্রভা চন্দ্রচূড়কে সামনে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন চান্দ্রেয়র

কাছে-"চান্দেয় কথা শোনো এনে দাও অপালাকে—আমি কথা দিচ্ছি শংখচূড়ের সাথে তার বিবাহ দেব—মিটিয়ে নেব ঝগড়া-চন্দ্রকে এনে দাও তার বৌদিদি।"

চান্দেয় বললো, "সে আর হবার নয় রানীমা। বার বার সুযোগ আসেনা জীবনে। তিনি যে নমুনা পেয়েছেন মনে-দিদির কী কষ্ট-সেই অন্ধকার বনের মধ্যে অসংখ্য হিংস্র জন্তুর মাঝ দিয়ে ফিরতে হবে নিজের রাজ্যে—কত কাঁদলেন, বললেন চান্দেয় ভাই কত আশা নিয়ে এসছিলাম তবে চলি। বললাম ভয় পাও তো ফিরে চল, থাকবে আমার পর্ণকুটিরে- আমি আর নই যুবরাজের দেহরক্ষী- আমি আবার হয়ে গেছি তস্কর চান্দেয়। যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন অন্ততঃ আশ্রয় আর অর্থের অভাব হবে না।"

চন্দ্রচূড় বললো, চান্দেয় দাদা বৌদি কই? চান্দেয় বললো ভাই চন্দ্রচূড়-তিনি আর তোমার বৌদি নন-এরা সব তাঁকে বন্দিনী করেছিলেন আমি তাঁকে মুক্তি দিয়েছি। মহারাজ তাঁর শাস্তি দেবেন-তেমনই নিশ্চয়ই পুরস্কৃতও করবেন- অহিংবাবে বন্দী করার জন্য যুবরাজের প্রাণরক্ষার জন্য।

নগেন্দ্রশংকর বললেন, "স্বীকার করছি তুমি শ্রেষ্ঠ তস্কর এই রাজ্যে শ্রেষ্ঠ তস্কর। কিন্তু তোমার চকুরী ত্যাগ করা চলবেনা—শংখচূড়ের দেহরক্ষী তোমায় থাকতেই হবে। তোমায় অনেক পুরস্কার দেব যদি আবার অপালাকে এনে দিতে পারো। আমি এই সভায় সকল প্রজার সামনে স্বীকার করছি অপালাকে আমি পুত্রবধূ করতে চাই। স্বীকার করছি, চান্দেয়র কথাতেই সম্মত হচ্ছি দুই দেশের মধ্যে সন্ধি করতে। চান্দেয় তুমি মুক্ত তুমি সচেষ্ট হলে রাজ্যের সবাইকে খুশি করতে পারো।

চান্দ্রেয় বললো, "হায় একথা কেন গতরাতে জানালেন না? এখন কী করি? সুপ্রভাদেবী বললেন চান্দ্রেয় আমি অন্যায় করেছিলাম। দেখতে চাইছিলাম তুমি কতটা পারো আমি তো অপলাকে কোলে পেয়েই খুশিই হয়েছিলাম। সে কথা কী সে বলেনি!

চান্দ্রেয় বললো, হ্যাঁ রানীমা আজও বলেছেন। বলেছেন ধরা দিওনা চান্দ্রেয়ভাই তোমার জীবনের জন্য ভয় পাচ্ছি ভাই। আমার জন্য কেন এতটা দায় নিচ্ছ? বলেছি, ভয় নেই দিদি রাজামশাইকে ঠিক রাজী করাবো। করিয়েছি রাজী। রানীমা, দিদি আমার যুবরাজের কক্ষে আছেন। যুবরাজ যান, আজ আর লজ্জা করার সময় নেই। আপনার মত সম্মুখযুদ্ধ জানিনা—আমি এক তস্কর—তস্করের কাছেই তো ধৈর্য্য ধরা—হাতের কৌশল দেখানো।

নগেন্দ্রশংকর সিংহাসন থেকে নেমে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সত্যিই তুমি তস্কর চান্দ্রেয়। আমার সন্দেহ ছিল তুমি লুকিয়েই রেখেছ অপলামাকে সর্বত্র খুঁজেছি-পাইনি। যুবরাজের ঘর খোঁজা হয়নি ভাবতেই পারিনি সেখানে রাখতে পারো। এখানেই তোমার জিৎ।"

রাজার আদেশে দূত গেল শংখরাজ্যে। শংখনগররাজ ও বিবাহ প্রস্তাবে সানন্দে সাড়া দিলেন। তস্কর চান্দ্রেয়র প্রচেষ্টায় দুইরাজ্যে ফিরে এল শান্তির পরিবেশ।

— ✪ —

বলাইয়ের বাঘ শিকার

✪ [গল্পটা দাদুর কাছে সংক্ষেপে শোনা—বলছি নিজের ভাষায় গ্রামগুলোর নামে ভুল থাকতেও পারে—শ্রোতারা একটু মার্জনা করবেন।]

বলাই এসে বাবাকে বললো, "বাবা, আর পড়বো না। ভাবছি, শিকারী হব।" পিতা বিজয়বাবু তাকালেন সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া ছেলের দিকে, "কেন ? এবদ্ধি পেলি কোথা থেকে ? রাজনীতি করছিস নাকি—গান্ধী বাবার চ্যালা হতে চাস ওঃনা সুভাষ বোসের—তাই শিকারী হবার নাম করে রাইফেল চালানো শিখতে চাস !" বলাই বললো, "না বাবা শিকারী হবো, বাঘ ভালুক হাতী গণ্ডার মারবো।"

বিজয়বাবু বললেন, "তার জন্যে শুধু রাইফেল চালনা শিখলে তো হবে না বাবা, অনেক কিছুই শিখতে হবে—জঙ্গলকে জানতে হবে, শিকারের বই পড়তে হবে, সাঁতার জানতে হবে গাছে চড়তে জানতে হবে—শারীরিক কসরৎ করতে হবে—জঙ্গলে পদে পদে বিপদ।"

বলাই বললো, "জানি বাবা, শিকারের বই পড়েই তো শিকারী হবার ইচ্ছা হয়েছে। —দ্যাখো বাবা, তোমার ওই তেলকল গোলদারী দোকান ওসব আমার ভাল লাগেনা। দাদা তো বেশ চালাচ্ছে—আমি ওসব পারবো না।"

বিজয়বাবু হাসলেন বললেন, "তোকে তো তা বলিনি। পঞ্চু নাইনে দুবার ফেল করলো—পড়াশুনায় ওর মন নেই--তাই ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিলাম। পারছেও—তাই ঠিক করেছি-ওর বিয়েটাও দিয়ে দেব।"

বলাই হেসে বললো, "সে বেশ ভাল হবে বাবা। তবে পণ নিওনা—সুন্দরী ছোট্ট দেখে একটা বৌদি এনে দিও।"

বিজয়বাবু বললেন. "সেই বৌদি এসে যদি বলে বলুবাবুকে শিকারে যেতে দেবনা।" বলাই বললো তা কেন বলবে বাবা। আমি তাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইবো-তখন তো আর না করতে পারবে না "

বিজয়বাবু বললেন. "তোমার ঠাকুর্দা ছিলেন পণ্ডিত মানুষ আমি তাঁর বোকা ছেলে পয়সা করেছি—কিন্তু পড়িনি। তোমার দাদাও পরেনি-তুমি পাচ্ছ তাই তোমার ভাল ছাত্র তৈরী করতে চেয়েছিলাম।"

বলাই বললো, "বাবা ছোট বেলা থেকে আমি ব্যায়াম করি, সাঁতার কাটি, কুড়ুল চালাই গুলতি ছুড়ি তীরধনুক প্রাকটিশ কবি-সবই শিকারী হব ভেবে। তখন তোমায় বলিনি এখন তো বড় হয়েছি বাবা! রাইফেল ক্লাব তো বেশি দূরে নয়। কেবল ইংরাজী শেখাতে চায় না—তুমি তো বাবা ইংরেজ ভক্ত—ওরা বলেছে তোমার পারমিশন পেলে শেখাবে।"

বিজয়বাবু ও বুঝলেন. পুত্র অনেক এগিয়ে গেছে। বললেন. "ঠিক আছে রাইফেল. বন্দুক, পিস্তল চালনা শেখ এখন-গ্রাজুয়েশন করে তবে শিকারে যেতে পাবে।"

বলাই বললো, আমি রাজী বাবা। শিকার করতে গেলে ধৈর্য্যের পরিক্ষা দিতেই হয়। পাঁচবছর ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রাকটিশ করলো আই এসসি পাশ করলো ফার্ষ্ট ডিভিশনে বি. এসসিতে নিল ফিজিক্স অনার্স। বিজয়বাবু. পঞ্চানন ও তার সদ্য পরিনীতা বধু নমিতা সবাই খুব খুশি।

পরীক্ষা ভালই দিয়েছে—তবে ফার্ষ্ট ক্লাশ পাবে না বলেই তার ধারণা। পরীক্ষা শেষ হতে হতে জুলাইয়ের মাঝামাঝি হয়ে গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে গতবছর। চারিদিকে হাহাকার

বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ। নিবন্নমানুষের দল কেঁদে বেড়াচ্ছে। বলাইয়ের মন সেদিকে নেই। তার সামনে এখন ছুটির দিন। পরীক্ষা শেষ হতেই চিঠি দিয়েছে মামার বাড়িতে। বসিরহাটের কাছে ঘোজডাঙ্গায়। সেখানে সে যাচ্ছে—

বিজয়বাবু বলেছেন, "হ্যাঁ ঠিক আছে—ওখানে সুবোধের সঙ্গে থেকে প্রথমে পাখি, খরগোস, বড়বেড়াল, ভাম মেরে হাত পাকা। পরে বড় জন্তু মারবি।"

বলাই বাবাকে, দাদাকে, প্রণাম করে বৌদির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বৌদি নমিতা তার চাইতে বয়সে ছোট, অষ্টম শ্রেনীতে পড়ার সময়ই তার বিয়ে হয়ে যায়। ছোট্ট খাট পুতুল পুতুল দেখতে ফর্সা, গোলমুখ, বড় বড় চুল, বড় বড় কালো চোখে সদাই হাসি মাখানো। খুব ভাব বলাইয়ের সঙ্গে কিন্তু বলাইকে এখনও প্রণাম করতে দেয়নি। লজ্জা পায় বলে "না দয়া করো ঠাকুরপো, আমায় পাপে ডুবিও না, তুমি কত্তো বড়, কত বিদ্বান।"

বলাই বলে, "ছোট বেলা থেকেই মা নেই। মায়ের আশীর্বাদ পাইনা—তাই তো বাবাকে বলে দাদার বিয়ে দিলাম।" নমিতা বলে, "হায় তাকি আমি জানি। তখন কী জানতুম যে আমার দেবর এমন পণ্ডিত মানুষ।" বলাই হার মানে।

নমিতা আজ বললো, "কামনা করি বিজয়ী হও ছোড়দা—বংশের নাম উজ্জ্বল কর।" বলাই বললো, "এই আমার আশীর্বাদ" পঞ্চানন বললো, 'খুব সাবধানে থাকবি। বাঙালীর হাতে অস্ত্র থাকলেই বাঙালীর হাত চুলকোয়। খুব প্রয়োজন না হলে রাইফেল বার করবি না।"

বলাই বললো, "নারে দাদা না। আমি তোর মত রগচটা নই।"

বিজয়বাবু বললেন, "মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আর একটা কথা—যদিও ইংরেজরা ভারত ছেড়ে পালাই পালাই করছে—তবু বলি, ওদের সঙ্গে কোন কারনেই বিবাদে যাবে না।" বলাই বললো, "চেষ্টা করবো বাবা-তবে জানোইতো ওদের সহ্য করতে পারি না। পঞ্চানন বললো, "কলেজে এখন রাজনীতির জোয়ার বইছে। নমিতা বললো "সর্বত্র বইছে। ওই লালমুখোদের না তাড়ালে শান্তি নেই।"

বলাই বেরিয়ে পড়লো। কাঁধের ব্যাগে পোষাক আর নানান টুকিটাকি জিনিস। পিঠে কাপড়ের ব্যাগে ঢাকা রাইফেল। পরনে শিকারীর মতই জলপাই রংয়ের পোষাক। কোমরের বেল্টে পিস্তল আর ছুরি। হাতে বড় রিষ্টওয়াচ।

নমিতা চুপি চুপি এসে বললো, "দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের মত দেখাচ্ছে। পারো তো আমার জন্য একটা ছোট্ট বোন এনো" হাসলো, বলাই হেসে জবাব দিল, "বাঘিনী আনবো ধরে। পারবে তো তাকে বশ করতে।" নমিতা বললো "সত্যিকারের বাঘিনী হলে পারতেও পারি।"

মনের আনন্দে দমদম এসে গেল। এখান থেকে ট্রেন ধরতে হবে। তার টিকিট ইন্টার ক্লাশের। ভিড়টা কম। ট্রেনে চারটে ভাগ—ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড, ইন্টার, থার্ড। এপথে ট্রেন কম। থার্ড ক্লাশে লোক যায় বাদুড় ঝোলা হয়ে।

ট্রেনে বসে দেখে গাড়ি ছাড়ছেনা। উঁকি মেরে দেখে সামনের ফার্ষ্ট ক্লাসের সামনে ভিড় গণ্ডগোল। যৌবনের আবেগে চলে গেল। শুনলো, ফার্ষ্ট ক্লাশের জেনুইন টিকিট হোল্ডারদের শ্বেতাঙ্গরা উঠতে দিচ্ছে না। ষ্টেশন মাষ্টার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, চেকার বাঙালী—তারা কিছুই করতে পারছে না।

বলাইয়ের পোষাক দেখে সবাই সরে দাঁড়াল। বলাই বললো, "জায়গা ছাড়ুন আমি উঠবো।" একটি শ্বেতাঙ্গ দরজার সামনেই দাঁড়ানো—বললো, উঠো মাৎ এ কামরা ফর ইউ-রোপীয়ানস্ অনলি।"

বলাই এক হ্যাঁচকায় তাকে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে নিল—কোমর থেকে টেনে বার করল পিস্তল, বললো. "শো য়োর টিকিট্স্।" অন্য তিনজন শ্বেতাঙ্গও এগিয়ে এসেছিল শ্বেতাঙ্গকে সাহায্যের জন্য। তারাও পিস্তল দেখে থমকে গেল।

দেখা গেল তাদের টিকিট ইন্টার ক্লাশের—যাবে বারাসত। বলাই বললো "য়ু স্যুডবী অ্যাসেমড—কাম উইথ মী' আয় অ্যাম অলসো এ প্যাসেঞ্জার অফ ইন্টার ক্লাশ।"

পাশে বসিয়ে নিয়ে গেল বারাসত পর্যন্ত। পিস্তলটা হাত থেকে সরায়নি। কী জানি কী করে ভেবে। নামার সময় "এক শ্বেতাঙ্গ বললো" য়ু আর এ ভেরী ব্রেভ বয়। হোয়েদার গোয়িং ফর এ স্যুটিং? বলাই বললো, ''নো—গোয়িং ফর এ হান্টিং শ্বেতাঙ্গটি বললো. "বী সাকসেশফুল।"

বসিরহাটে নেমে বাজারে এল। সেখানেই নামলো বৃষ্টি। বৃষ্টি থামতে থামতে সন্ধ্যা ঘনাল। কী করবো ভাবল বিচ্ছুক্ষন। তারপর এগিয়ে গেল পারঘাটায়। ইছামতী পেরুতে হবে—তারপরে আছে একটা খাল—তারপর তার মামার বাড়ির গ্রাম। চেনা রাস্তা—ছোট বেলা থেকে এসেছে অনেকবার। থেকেছে অনেকদিন। জমিদার বাড়ির ছেলে সুবোধ তার বন্ধু।

পারঘাটায় যাত্রী নেই—সে একা। ঘাট মাঝি বললো এই দুর্যোগে কেউ ওপারে যাবেনা—এখানেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। একবার ভাবলো বেশী পয়সা দিয়ে চলে যাই ওপারে। তারপর ভাবলো, না বসেই থাকি।

ঘণ্টাখানেক পরে দুজন লোক এল। তারা ব্যাপারী। ঘাটমাঝি বললো, তাহলে যাও খোকাবাবু এদের সঙ্গে। কথা বলে বুঝল এরা কেউ যাবেনা তার মামাদের গ্রামে। তবুও উঠে পড়ল নৌকায়। ভাবলো, শিকারের অভিজ্ঞতা হবে। সেখানেও তো অন্ধকারে একা একা থাকতে হবে। অন্ধকার তো ঘন নয়। ব্যাপারীরা বললেন, "ভয় নেই খোকা। একটু সাবধান থেকো, বর্ষাকাল সাপ থাকতে পারে—নয়তো বনশুয়োর। ভয় নেই ওরা দল বেঁধে থাকে। মানুষকে ভয় পায়।"

মনের আনন্দে খাল পার হল। পাটাতন পাতা। সেখানে সামান্য জল। তাতে সে ক্লান্ত হয়নি। জুতো খুলে প্যান্টগুড়িয়ে পার হল। এপারে এসে নিজেকে রেডি করে নিয়ে চলতে থাকলো। পাশের নালা দিয়ে প্রবল বেগে জল নামছে খালে, কুলুকুলু শব্দ হচ্ছে। নালার পাশে কচুবন।

দেখলো বাঁদিকের বনে ঢুকে গেল একটা সাপ। পরিস্কার চওড়া রাস্তা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার চলতে থাকলো। শব্দ পেল 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ' চমকে বুঝলো বনশুকর। এরা জঙ্গলে কাউকে মানেনা। অন্য প্রানীরা চলে নিঃশব্দে—এরা সশব্দে চলে। ভাবী শান্ত প্রাণী, কিন্তু রাগলে ভীষণ গোঁ।

টর্চ জ্বাললো শূকরের চোখ দুটো ঝিকমিক করে উঠলো বলাই দেখলো, দাঁতাল এই একানে দাঁড়ালদেরই ভয়। তৃন-ভেজীদের মধ্যে যারা একানে দলছুট তারা খুব রাগী হয়।

দাঁতলটা সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল। বলাই এক লাফে সরে গেল। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েই সেটা আবার তার দিকে তেড়ে এল। বলাই এবারেও লাফিয়ে সরে গেল—সে মাটিতে নেমেই পিস্তলটার শব্দ করলো—শব্দে চমকে বরাটা আর দাঁড়ালনা কচুবনের ভেতরে ছুটে ঢুকে গেল। বলাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা

করলো—টর্চ জ্বালিয়ে দেখলো এদিক ওদিক।

তারপর হাঁটা দিল। কাছেই জমিদারদের সরোবর। ওপারেই জমিদারবাড়ি। সেদিকে তাকাতেই চমকে গেল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অনেকগুলো মশালের আলো দেখা গেল। এক সেকেণ্ডে বুঝে নিল ডাকাত পড়েছে জমিদার বাড়িতে।

সামান্য ভেবে পিঠের ব্যাগটা নামাল এক ঝোপের মধ্যে কাপড়ের ব্যাগ থেকে বার করলো রাইফেল। গুলি ভরল দুটো নলেই। ধীর পায়ে ঝোপের মধ্য দিয়ে এগুতে থাকলো।

ভাবলো, সুবোধ তো ভালই বন্দুক চালায়। সে ভাল শিকারী। তার কাছেই শিকারের হাতে খড়ি নিতে এসেছে ঘোজাডাঙ্গায়। ডাকাতরা কি সুবোধের কথা জানে না।

দেখলো জমিদাব বাড়িব দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে ডাকাতরা। জমিদার বাড়িতে টর্চ জ্বলছে। বন্দুকের শব্দ হলো। সুবোধ নিশ্চই। চীৎকার চেঁচামেচি চলছে। দরজা ভাঙার চেষ্টা চলছেই।

একটা মোটা কদম্বের গাছ—তার আড়ালে দাঁড়াল বলাই রাইফেল তুলে নিল হাতে—তারপরই ট্রিগার টেনে দিল। একটা দুটো। আবার গুলি ভরল দ্রুত হাতে।

"পুলিশ পুলিশ" চীৎকার উঠলো। ডাকাতরা দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ছুট লাগালো অন্ধকারে। জমিদার বাড়ি থেকে লোকজন বাইরে এল। হ্যাজাক জ্বলছে। কারো হাতে টর্চ। বলাই ধীর পায়ে ফিবে গেল ঝোপের কাছে। ব্যাগ নিল পিঠে। রাইফেল হাতে ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল চেঁচিয়ে বললো "সুবোধ গুলি চালাসনা যেন আমি বলাই।" সুবোধ বললো, "এগিয়ে আয় আলোয়—একী রাইফেল হাতে-" নামা রাইফেল"—বলাই কাছে এসে দাঁড়াল। সুবোধ জড়িয়ে

ধরলো বুকে।

সামনে দাঁড়ানো জমিদার—তার বাবাকে বললো "বাবা পুলিশ নয়, বলাই বাচিয়েছে আমাদের ডাকাতদের হাত থেকে।" বলাই এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

সুবোধ বললো, "খুব বাঁচিয়েছিস··একা আমি পারতামনা কবে রাইফেল কিনলি? রাইফেল, পিস্তল নিয়ে এখানে এলিই বা কেন?'

বলাই বললো "তোর কাছে শিকার করা শিখবো বলেই চিঠিও দিয়েছি।" সুবোধ বললো "পাইনি। ·তবে আমি আর কী শেখাবো। এখানে বড়জোর গো বাঘা মারতে পারবি। পাবি অনেক বনশূকর।" বলাই বললো "তাতেই হোক আমার হাতখড়ি।"

সুবোধের মা সে রাত্রে বলাইকে ছাড়লেন না। দারোয়ান পাঠিয়ে বলাইয়ের মামা দেবেন্দ্রকে জানালেন ঘটনাটা। বলাই খুবই ক্ষুধার্ত ছিল—ফলে সেই গভীর রাতেও সে ভালই খেল।

সুবোধ বললো "কাল দুপুরে হবে খাবার প্রতিযোগিতা।" বলাই বললো, "সে আমি হেরেই যাবু। শহরে এখন অন্নাভাব তাই খাওয়ার পরিমান কমে গেছে।"

দুদিন খেয়ে ঘুমিয়ে অড্ডা মেরেই বলাই বোড় ফিল করতে থাকলো। সুবোধ তা বুঝে বললো, চল আজ রাত্রে যাব জঙ্গলে।

এক জায়গায় এসে সুবোধ তার জোরাল চারব্যাটারীর বক্সটর্চ জ্বেলে আলোয় নাচ দেখাতে থাকলো—মিনিট কয়েক পরে দেখা গেল কয়েকটা খরগোশ আলোর রেখাগুলোকে ধরতে চেষ্টা করছে—মনে হচ্ছে যেন তারাও নাচছে। সুবোধ বললো

"মার" বলাই বললো "না। এসব মারতে পারবোনা" সুবোধ বললো. "খাবার মাংস খুব সুস্বাদু ছররা দিয়ে মারতে হয়।, চল্ তবে ফিরি।"

ফেরার পথে একটা গাছের ওপর ঝটপট আওয়াজ শোনা গেল। সুবোধ টর্চ ফেললো একটা কালো ভাম পাখির ছানা ধরেছে। বলল মার বলাই গুলি করল—ভাম আর পাখির ছিন্নভিন্ন দেহটা পড়ল সামনেই। বলাই বললো ঈস কী বাজে। সুবোধ বললো রাইফেলে মারলি কেন? পিস্তল চালাতে পারতিস। বলাই বোকা বনে গেল।

সুবোধ বললো. ছোট জীবজন্তুদের মারার জন্য চাই ছররা মানুষ তদের মাংস খায়। বন্দুকের গুলিতে মারা যায় হরিণ, শুকর তাও বড় দাঁতালকে সামলানো যায় না। বাঘ, ভালুক, গণ্ডার. হাতী,—এইসব ভারী জন্তুকে থামাতে চাই রাইফেল। অবশ্য ভালো শিকারীরা বন্দুকেই এসব শিকার করেছেন এককালে।

বলাই বললো, তুই তো বাঘও মেরেছিস এই বন্দুক দিয়েই। সুবোধ হাসলো, বললো প্রায়ই মারতে হয়—গো বাঘা গুলো প্রায়ই হামলা করে। বোকা শোকা বাঘ—পটাপট মরে। বলাই বললো আমি তাই মারতে চাই। অন্ততঃ বাড়িতে ফিরে বলতেতো পারবো যে বাঘ মেরেছি। নইলে বৌদির কাছে মুখ দেখানো যাবেনা। সুবোধ বললো, "লোক লাগিয়েছি খোঁজ রাখতো।"

একদিন সুবোধ কটা বালুহাঁস মেরে আনল। বলাইয়ের পাখি মারতে ভাল লাগেনা। মাংস খেল—বেশ সুস্বাদু।

মামার বাড়িতে ফেরে রাত্রে। কেবল শুতে যায়। নইলে সারাদিন ভুবন্ধুতে আড্ডা মারে, গল্প করে। শিকারের আলোচনা করে।

বলাই বোঝে বই পড়ে যা জেনেছে সুবোধ তা শিখেছে অভিজ্ঞতায়। এবং বুঝে নিল, পড়ার চাইতে শিকারে অভিজ্ঞতাই আসল ব্যাপার।

এক রাত্রে ছোট মামা নগেন্দ্র বললো, আমাদের কচুর জমিতে রোজ শুয়োরের দল নামছে। এত তো রাইফেল নিয়ে ঘুরছিস—কটা দাঁতালকে মেরে দেনা। বলাই বললো, "ছোটমামা সুবোধকে বল।" সে বললো "ভয় পাই।"

জমিদারের ছেলেকে বলতে ভয় পেতেই পারে। তাছাড়া সে বয়সেও ছোট। নরেন্দ্র তার চাইতে বয়সে ছোট। তাই তাকেই সে মামু বলে।

সুবোধ সব শুনে হাসলো বললো, "ভয় নয় আসলে লজ্জায় বলে না। অনেকটা দূর—তারপর চাষীর কুটিরটা ভাল নয়। চল যাবো কটা দাঁতাল মারি—টিপ প্র্যাকটিস তো হবে। যে কোন জন্তুর গণ্ডার ছাড়া দুচোখের মাঝখানে গুলি লাগাতে পারলেই জন্তু পড়ে যায় ঠিক ওর পেছনেই থাকে মস্তিস্ক। বুকে লাগাতেও পারলেও হয়—পেছনেই হৃৎপিণ্ড থাকে।"

বলাই বললো, "পড়েছি বইয়ে। এবার শিখবো হাতে নাতে। সুবোধ বললো, "বরা আসে দলে দলে—প্যানাস্তারা পিটিয়ে তাড়ানোই ভাল। গুলির দাম ওঠে না। অবশ্য গ্রামের লোকের খুব আনন্দ হয়—বড়া খানা হয় তাদের।"

রাতের খাবার জল নিয়ে তিনজনে পৌছালো পাহারা ঘরে সেখানে ছিল চাষী। সে ভাল করে খড় পেতেছে সুবোধের,

জন্য, নরেন্দ্র খাবারের দায়িত্বে ছিল। সন্ধ্যা নামতেই মশার উপদ্রব বাড়লো। চাষীটা বিড়ি টানছিল। সুবোধ দাবড়ানি দিল ফ্যাল বিড়ি—এসবের গন্ধে কখনও বুনো জন্তুরা আসবে। চাষীটা ভয়ে বিড়ি ফেলে দিল হাতজোড় করে বললো, "কর্তা এ ব্যাটা শূওরের দল ওসব কিছুই মানে না—দ্যাখেন না এখুনি আসবে। মা শূকরীটা যা মোটা না কর্তা সারা গাঁয়ের ভোজ হয়ে যাবে।"

সামান্য পরই শুয়োররা এল—১২-১৩টা—বড় বাচ্চা মিলিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে মাটি খুঁড়ে কচু খেতে থাকলো। সুবোধের চার ব্যাটারীর বক্সটর্চ'টাই স্পটারের কাজ করেছিল-সুবোধ বললো "মার" বলেই নিজেও বন্দুক চালালো। বলাই পর পর দুটো ফায়ার করল।

ধপ ধপ করে তিনটে শুয়োর পড়ে গেল। অন্যগুলো পলকে অদৃশ্য। পড়ছেনা মোক্ষম মার—এক্কেবারে মাটি নিচ্ছে।' বললো চাষীটা। নরেন্দ্র বললো, 'নামি।' সুবোধ বললো না—এখন না। একটা মাঝারি মাপের দাঁতাল—হঠাৎ ঘাড় বেকিয়ে উঠে দাঁড়াল—ছুটলো খানিকটা—আবার গোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেল।

সুবোধ নরেন্দ্রকে বললো, "এই টর্চ'টা ধরে নামো। ওইদিকে আলো থাকবে। হ্যাঁ-এইভাবে।" চাষীকে বললো "সাবধান, সব কটাই বেঁচে আছে- ছুরি নিয়ে ফাঁসাতে হবে। বলাই গুলিভরা আছে তো। বুড়িটাকে আর একটা গুলি কর।" বলাই মোটা মা শুকরীটার বুকের কাছটাতে গুলি করল। সুবোধ আর চাষাটা মিলে অন্য দুটোকে ম্যানেজ করল ছুরি নিয়ে।

কাজ সেরে সুবোধ বললো, "বন্যজন্তুদের জান বড় কড়া। মরেছে নিশ্চিত জেনে তবেই কাছে যাওয়া উচিত।" মাচানে ফিরে এসে মশার কামড়ে সারারাত ঘুমাতে পারলনা। সুবোধ

নরেন, চাষীটা নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে রইল। বলাইয়ের বিরক্তিতে সুবোধ বললো, "তাহলে তো আর শিকারী হতেই পারবিনা। ধৈর্য্য চাই। শিকারে ধৈর্য্য ধরাটাই আসল।" ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে বসে থাকতে হবে বলাই।"

সকালে চাষীর ওপর ভার দিয়ে তিনর্জনে গ্রামে ফিরল। গ্রামের লোকেরা খুব খুশি। নরেন্দ্র তার দাদা দেবেন্দ্রকে বললো, "দাদা দেখো ছোট মামু একদিন বড় শিকারী হবে। বড় মা শুকরীটার বুক একগুলিতে ফাটিয়ে দিয়েছে। হাতে খুব টিপ ওর।"

আবার আলসেমি দেখা দিল। আগষ্ট মাস পড়ে গেল। বাবাকে চিঠিতে জানাল -এই কদিনের কথা। আশীর্ব্বাদ চাইল যেন বাঘ মারতে পারি। বৌদিকে জানাল "ছোট মামা তো আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট—তারপরে পড়াশুনা করেই না—চাষবাস দেখাশুনা করে-তাকে তো প্রণাম করি—সে তা কিছু বলে না—তবে তুমি কেন বাধা বাধা দাও। এখন কলমের সাহায্যে জানালাম প্রণাম। তাতে তো বাধা দিতে পারবেনা। নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ জানাবে।"

একদিন দুই বন্ধু পথে হাঁটছিল। এমন সময় একটা লোক এসে সুবোধের পায়ে পড়ল। বলাই ভাবল, জমির খাজনা দিতে পারেনি তাই হয়তো সুবোধকে ধরছে। সবোধ না চমকে বলল, "গোপাল কী হল—খবর পাওয়া গেছে?

গোপাল বললো, "হ্যাঁ ছোট হুজুর দিঘড়ের জমিদার শরদিন্দুবাবু একজন শিকারী খুঁজছেন। একটা বিরাট বাঘ এসে তার জমিদাড়ীতে ছটা গরু, চারটে বলদ মেরেছে। কেউ তার সামনা করতে পারছেনা। যাবেন ছোট কর্ত্তা—আমি বাবুকে বলে এসেছি কিন্তু।"

সুবোধ গোপালকে দুটো টাকা দিল। তারপর বলাইকে প্রশ্ন করল, "যাবি তো?" বলাই বললো, "কত দিনের সখ।" সুবোধ বললো, "গোপাল সঙ্গে থাকবি তো? গোপাল বললো "সে আর বলতে—বাবু বড় হুজুরকে বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পরি চলুন। মারতে পারলে খুবভাল বিরাট বাঘ—পা মেপে দেখেছি—৮/৯ ফুট হবেই।" সুবোধ বললো, "তাহলে বঙ্গ্ রয়্যাল বেঙ্গল। গোপাল বললো, "হ্যাঁ, গ্রামের লোকেরা খুব ভয়ে ভয়ে আছে।"

গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে গৃহদেবতা মা চণ্ডীর সিঁদূর কপালে দিযে তিনজন যাত্রা করলো পরদিন। যাত্রাপথে সকলের সাবধানীগুলো মনে পড়তে থাকলো।

শরদিন্দু বাবুর বাড়িতে পৌঁছানোর পর তিনি সাদরে আমন্ত্রণ জানলেন। সুবোধকে তিনি চেনেন, জানেন বড় শিকারী বলে। বাড়ির সকলের খোঁজ খবর নিলেন। বলাই শিক্ষিত শিকারী জেনে খুশি হলেন। তার রাইফেল দেখলেন। বললেন, আমারও সব ছিল, আমিও যাবো—আমার রাইফেল গুলো দেখবে চল। মুনীষ পাঠিয়েছি—খাবার বাঁধবে মড়ির কাছে মড়ি শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে—এসো খাও দাও—বিকেলে বের হবো।"

সুবোধ বললো, "বলাই বাঘ সুন্দর দেখতে—এমনিতে ভীরু তবে রেগে গেলে বিষম ভয়ংকর। গোপাল বনের চোরা শিকারী—এখানকার জঙ্গল ওর নখদর্পনে—ওর কথামতই আমি শিকার করি।"

মাচানে হ্যাজাক জ্বালার ব্যবস্থা আছে। পুরু করে খড়ের গদি—তারপর শতরঞ্চি চাদর পাতা। চায়ের ফ্লাস্ক, স্পটার নানারিধ সরঞ্জাম। গোপাল হাসলো, কিন্তু কিছু বললো না।

সন্ধ্যার সামান্য আগে স্বল্পাহার সেরে চারজনে উঠলো

মাচানে। মইটা তুলে নিল। লোকজনেরা হল্লা করতে করতে চলে গেল। অন্ধকার বাড়তে থাকল ধীরে ধীরে।

মাড়ির কাছে হাল্কা স্পটারের আলো, বাঘটা একবার দেখা দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল।

সামান্য সময় পরেই বাঘ এল —মাড়িতে দাঁড়াল পিছন ফিরে। সকলের হাতে রাইফেল রেডি বাঘ সামান্য সরে বসলো। বলাই ভাবলো মারি কিন্তু সুবোধের নির্দেশ নেই-এমন সময় বাজপড়ার মত আওয়াজ এল কানে। শরদিন্দুবাবু রাইফেল ছুঁড়েছেন বাঘ লাফিয়ে সরে গেল। 'গুলিটা লেগেছে বাঘের ডানপায়ের তলায়' বললো সুবোধ। বলাই কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না -ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যাথা। শুয়ে পড়লো ধীরে ধীরে। হাতদিয়ে কান আর ঘাড় দেখাল।

গোপাল বললো 'আচমকা কানের কাছে শব্দে এমন হয়েছে- ভয় নেই এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।' বলে সুবোধকে বললো, 'পা দুটো ধরেন কর্তা।' গোপাল পিঠ, কাঁধ ম্যাসজ করতে করতে হঠাৎ ঘাড়ট একটু ঘুরিয়ে দিল। 'কট' করে শব্দ হল, বলাই ভালভাবে নিশ্বাস নিল। ধীরে ধীরে ঠিক হল সে, সুবোধকে বললো, "গোপাল কি করে বুঝলো কে জানে।"

বাঘের সাড়া শব্দ নেই। শরদিন্দু বাবু স্পটার ঘোরাচ্ছেন বাঘ কাছেই ছিল, তারও তো ক্ষুধা আছে। দুপুরে সুযোগ পায়নি। সান্ধ্য আহারে এসে গুলি খেয়েছে। বাঘ ধীরপায়ে গুড়ি মেরে এগোচ্ছিল-দেখতে পেয়েই সুবোধের গায়ে ঠেলা দিলেন। সুবোধ সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালো। বাঘ ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। গর্জন করতে থাকলো। সমস্ত বন কাঁপতে থাকল।

বাঘকে দেখা যাচ্ছেনা। ধীরে ধীরে তার গর্জনও থেমে গেল। শরদিন্দু বাবু বললেন, "মরেছে ব্যাটা।" গোপাল বললো,

"না, হুজুর। বাঘ আলতো পায়ে সরে গেছে। ছোট হুজুরের গুলিটা লেগেছে পিঠে-তাতে বাঘ মরে না। সাবধান। ক্ষিদে পেটে, চুপচাপ বসেন, আবার আসবো।"

না, বাঘ আর আসেনা। শরদিন্দু বাবর ঢুলতে ঢুলতে ওখানেই শুয়ে পড়লেন। তাঁর নাক ডাকতে শুরু করে দিল। বলাই বললো, "এ তো দেখছি, বাঘেও হার মানবে" গোপাল আর সুবোধ হাসলো।

রাত দেড়টার সময় সুবোধ বললো, "বলাই বাঁশের খুটিতে হেলান দিয়ে ঢুলে নে খানিকক্ষণ।" বলাই বললো "তুই!" সুবোধ বললো, "সবাই ঘুমুবে "

পাখির কাকলিতে ঘুম ভাঙ্গল বলাইয়ের। দেখল, সুবোধ বন্দুক কোলে ঘুমাচ্ছে-গোপাল জমিদারবাবুর পায়ের তলায় গুড়ি মেরে শুয়ে আছে।

সুন্দর সকাল। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। সবুজ গাছের পাতায় সূর্য্যালোকে ঝিলমিল করছে যেন, ঘুমের আমেজ কাটতেই খেয়াল হল, মাড়ির দিকে চোখ পড়ল। দেখল দুটো শেয়াল টানাটানি করছে। বুঝলো বাঘ বা বড় কোন জন্তু কাছে নেই। শেয়ালেরা তাদের ধারেকাছে থাকে না। গোপালকে ঠেলা দিল। সে সড়কি হাতে উঠে বসলো চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো 'কী আদেশ ছোট সাহেব।'

বলাই হাসলো, বললো, "ছোট সাহেব? সাহেব বলোনা গোপালদা-বরন বলাই বলো। জানো এখানে আসার পথে চারটে সাহেবকে ঠেঙ্গিয়েছি।" গোপাল বললো, 'সত্যি? বলাই বললো ঘটনাটা। গল্প শোনার পর গোপাল বললো, "তাহলে ছোটদা ডাকি?" বলাই বললো "তা ডাকতে পারো।"

সুবোধ আর শরদিন্দু বাবুও উঠে পড়েছেন। সুবোধ বললো, “গোপাল মই নামা-নীচে নামবো।” গোপাল ধীরে ধীরে নামাল মইটা। চারজনই নামল নীচে। জমিদার বাবু কয়েকটা বৈঠক দিলেন। বললেন, “হাঁটুগুলো জং ধরে গেছে। দুর, এই বুড়ো বয়সে কী এসব পোষায়। গোপাল, চায়ের ব্যবস্থা কর।”

গোপাল বললো, “এখানে কোথায় কী পাবো হুজুর।” জমিদারবাবু বললেন, “ব্যাটাদের কতবার করে বলে এলাম আসতে সময় নিস্থে। দেখি।”

সুবোধ বললো, “গোপাল সাবধান বাঘ কখনো সকালের দিকেও মড়িতে আসে। এর আসার চান্স তো বেশি-কেন না সারারাত খেতে পায়নি।”

শরদিন্দু বাবু বললেন, “তাহলে গোপাল মাচানে উঠেই বসি।” বলে মাচানে উঠে গেলেন। সুবোধ বললো, “গোপাল এখানে থাক। আমরা দুজন একটু কাছাকাছি ঘুরে আসি।”

দুবন্ধুতে চলেছে, হাতে উদ্যত অস্ত্র। সকালের সোনালী রোদ্দুরে জঙ্গল যেন জেগে উঠেছে। সুবোধ বললো, “এই জন্যই ধনী লোকেদের, সিনিয়রদের জঙ্গলে নিতে নেই, কোন কিছু না ভেবেই গুলি চালিয়ে বাঘটাকে দিলেন আহত করে। এখন ঝোপে জঙ্গলে খুঁজে বাঘটাকে মারতে হবেই বলাই নইলে পরে হয়তো বাঘটা মানুষ খেকো হয়ে যেতে পারে।”

বলাই বললো, তোর গুলিটা ফালতু খরচ হলো। সুবোধ বললো, ‘কি করি বল উনি ইঙ্গিত করলেন দিলাম চালিয়ে।” বলাই বললো, সামনের পায়ে চোট—হাঁটতে কষ্ট পাচ্ছে বেচারা দূরে যেতে পারেনি। কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে। খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।”

খড়ি থেকে সামান্য দূরত্বে এসেই সুবোধ বললো, "পাখিরা থেমে গেছে সাবধান।" বলাই প্রস্তুত হয়ে দেখলো সামনে দিয়ে আসছে দুটো দাঁতাল। সুবোধ বললো, "গাছের আড়ালে যা।" বলাই চলে গেল নিকটবর্তী একটা মোটা গাছের আড়ালে— সুবোধও সরে গেল—অন্য গাছের আড়ালে। বেশ শব্দ করেই বীরদর্পে আসছিল দাঁতালদ্বয়—হঠাৎ একটা ঝটাপটির শব্দ।

বলাই দেখল, পিছনের শুয়োরটার ওপর বাঘ। সামনের শুয়োরটা বাঘের গায়ে। বাঘ 'গাক' করে সরে গেল। শুয়োরেরা তার পিছনে। ঝোপের মধ্যে লড়াই হচ্ছে বাঘে শুকরে। সুবোধ বললো, "বলাই এই সুযোগ।" প্রস্তুত রাইফেলটা আবার দেখে নিল বলাই।

ধীরপায়ে এগুতে থাকলো বাঘের দিকে। বাঘ বিপর্যস্ত-বার বার স্থান পরিবর্তন করছে। সুবোধ লক্ষ্যস্থির করে বন্দুক ছুঁড়ে দিল—একটা শুকর পড়ে গেল-বাঘ লাফ দিয়ে পালালো। অন্য দাঁতালটা তেড়ে এল সুবোধের দিকে। সুবোধ তখন গুলি ভরছিল—বলাই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল— আবার তেড়ে এল দাঁতালটা—সামনাসামনি— তার বুক ফুটো করে থামিয়ে দিল রাইফেলের বুলেট। পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দাঁতালটা। সুবোধ খুঁচিয়ে দেখল—নটনড়নচড়ন।

জোড়া গুলির শব্দে ব্যাকুল হলেন চা পান রত জমিদার-বাবু। বললেন, "গোপাল তাহলে ওরা বাঘটা পেয়ে গেল।" অনেকগুলো চাষী মানুষ এসেছিল খাবার নিয়ে। সদববলে সেখানে গিয়ে দেখলেন—বাঘ নয় জোড়া শুকর। গ্রাম বাসীরা সেদুটো বয়ে নিয়ে গেল।

জমিদার তাদের সাবধান করে দিলেন, বললেন, "সাবধান,

আহত বাঘ আছে—আজ এদিকে কোন কাজে আসবি না। আমরা বাঘটাকে খুঁজবো-মারবো- তবে যাব। দুপুরেও না ফিরলে খাবার আনবি এখানেই। অনেকে আসবি দলবেঁধে।"

সুবোধ বললো, "আমরা এখন দুদলে ভাগ হয়ে যাবো। আমার ধারণা ডানদিকের এই জঙ্গলে বাঘটাকে পাওয়া যাবে এটাকে ঘিরে আমরা যাবো। আমি আর জ্যেঠু যাব-গোপাল আর বলাই –যাবো নদীর ধার পর্যন্ত। দেখা হলে তবে ফিরবো। সাবধানে-সবসময় রেডি হয়ে পা ফেলবে। মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে যাবে। বাঘ ক্ষুধার্ত—উঁকি ঝুঁকি মারতেও পারে।"

ওরা দুজন চলে যেতে বলাই বেশ অসহায় বোধ করল। সুবোধকে তার সঙ্গে দিলে ভাল হতো। লজ্জায় সেকথা সে বলতে পারল না। গোপাল বললো, "ছোটদা ভাববেন না—বাঘটা আমরাই পাবো। ভয় নেই—চোখ খুলে চলেন। আপনি সেই সাহেব পেটানোর গল্পটা আবার বলতে বলতে চলেন। বাঘের পেটে এখন বিষম ক্ষিদে- ভয় না পেয়ে বরা মারতে গেছিল বরার সঙ্গে পারে নাকি- পেট চিরে দেবেনা। অবশ্য এটা বড় বাঘ—এর জোর বেশি—তবু দুখানা চোট পাইছে তো—তার ওপর ডান থাবার কাছে চোট। তাতে অবশ্য বাঘের বিন্দু আসে যায়না—গায়ে তো অসম্ভব জোর। একটা বলদকে বয়ে নিয়ে যায়—বোঝেন। অবশ্য আপনার জোরটাও কম নয়—সাহেব পিটিয়েছেন ও ছোটদা, সাহেবরা বাঘের চাইতে ভয়ানক।"

বলাই বললো, "ওদের তো শরীরের জোর নয়—মারণাস্ত্রের জোর। আমার কাছে পিস্তলটা ছিল বলেই তো মার খেল। নইলে আমাকেই ওরা মার দিত। তাই হয় গোপাল তাই হয়। যার যত মারণাস্ত্রের জোর সেই তত শক্তিমান,

সেই-ই রাজত্ব করে। যেমন ধরো এই বাঘটা ওর কত শক্তি বল—আমরা কি পারি ওর সাথে—স্রেফ বন্দুকের জোরে মারি।"

কথা বলতে বলতে ওরা চললেও চোখ ছিল সতর্ক। বিশেষতঃ গোপালের। সে বহুদিন ধরে জঙ্গলে ঘুরছে। সে হঠাৎ থেমে জানাল, "ওই তো বাঘ।" ছোট ঝোপের মাথার ওপর দিয়ে বাঘ দেখছে ওদের। চোখে ভয়ংকর রাগ। গর্জন করে বাঘ ঢুকে গেল ঝোপের মধ্যে। গোপাল বললো "ছোটদা সাবধান।" বলাই শক্ত হাতে ধরলো তার রাইফেল পিছিয়ে এল কিছুটা।

ঝোপের মধ্য থেকে বাঘ ঝাঁপ দিল গোপালের দিকে। গোপাল সতর্ক ঠিকই। সে সামান্য পিছিয়ে গিয়ে সড়কি চালালো সড়কি বিধে গেল বাঘের বুকে- বাঘ পড়ল মাটিতে তার ভার গোপালও পড়লো ছিটকে। বলাইয়ের বুলেট বাঘের শিরদাঁড়ায় লাগলো। বাঘ কাৎ হয়ে পড়ে গেল। গোপাল সামলে নিয়ে উঠতে না উঠতেই বলাই ছুটে এসে দ্বিতীয় বুলেটটাও খালি করে দিল বাঘের বুকে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে।

তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়ল সেখানেই —শুয়ে পড়ল সেখানেই। গোপাল বাঘের মরণ দেখছিল—হঠাৎ বলাইকে শুয়ে পড়তে দেখে ছুটে কাছে এল। জলের বোতল থেকে জল নিয়ে ছেটাল তার মুখে, হাতে করে জল নিয়ে দিল কানের পাশে। বসলো বলাইয়ের মাথা কোলে নিয়ে।

পর পর দু'বার ফায়ারের শব্দে সুবোধ ব্যস্ত হল— এস্তপায়ে এসে দেখল। গোপালকে বললো, "তুই জমিদার জেঠুকে ডেকে আন আমি দেখছি।" গোপাল দ্রুত পায়ে চলে গেল সুবোধ বলাইয়ের ঘাড়ে, কানের পাশে চোখের পাশে হাত বোলাতে থাকলো। জামার বোতামগুলো খুলে দিল। ধীরে ধীরে চোখ মেলল বলাই।

জমিদারবাবু এলেন, বললেন, "একেবারে মোক্ষম মার দিয়েছ বলাই। নটনড়ন চড়ন খটাস্ হয়ে গেছে।" বলাই বললো, "মারতে পেরেছি! মরেছে!" সুবোধ বললো, বলাই টেনশন চলবেনা—নিজেকে সহজ রাখতে হবে। শিকারে এলে মৃত্যুভয় তো থাকবেই—সেটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার—তবু এতটা টেনশড্ হয়ে থাকলে চলবে না। বিশ্বাস কর বলাই—তুই নার্ভাস হলেও তোর হাতের টিপ দেখবার মতো—খুব আনন্দ পেলাম—ঠিক সময়ে গুলি না চালালে গোপালকে বাঁচানো যেতনা" গোপাল বললো, "ছোটদা, তুমি আমার জান বাঁচিয়েছ।" বলাই বললো, তুমি আমার আজ দিলে সন্মান। তোমাদের সাহায্য না পেলে আমার আবাল্যের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত। কতদিনের শখ বাঘ মারবো।"

সুবোধ বললো, "নে, ওঠ। খুব ক্ষিদে পেয়েগেছে।" বলাই উঠতে তাকে নিয়ে এল বাঘের কাছে—বললো, "দেখ কত বড় বাঘ—আসল রয়াল বেঙ্গল—কী জোর ভাব—এইখানে জ্যেঠুর গুলি, এইখানে আমার গুলি, এইখানে গোপালের সড়কি গিথে আছে, এইখানে তোর পহেলাগুলি আর এই শেষ বুলেট। এত চেষ্টায় মারা গেল। তোর মত টিপ থাকা শিকারে খুব দরকার। আমিও খুব নার্ভাস ছিলাম—এত বড় বাঘ তো মারিনি কখনও।"

তারপর গোপালকে বললো, "গোপাল ছালটা সাবধানে ছাড়াবি। বলাইয়ের বাড়ি পাঠাতে হবে।" বলাই লজ্জা পেল বললো, "নানা ওসব নিতে পারবো না।"

শরদিন্দুবাবু বললেন, "তা বললে হবেনা বলাই। আমি ঠিক পাঠিয়ে দেব। না হয় একদিন চলেই যাবো। তোমার মাকে গল্প করে বলে আসবো।"

বলাই বললো. "মা তো নেই জ্যেঠু। বাবা আছেন। তিনি ভয়ে ভয়ে আসতে দিয়েছেন। তবে আমার বৌদি আছে তো। সে খুব আনন্দ পাবে।"

খেয়ে নেয়ে বিশ্রাম নিয়ে ফিরলো। গোপাল রয়ে গেল চামড়াটার জন্যে। পরদিন চিঠি লিখলো বাবাকে। জানাল সাফল্যের কথা। শেষে লিখলো, "প্রণাম নেবেন আপনি সঠিকভাবেই আমার জীবন পরিচালনা করেছেন।"

তিনদিন বাদে সকলকে প্রণাম জানিয়ে সুবোধকে বার বার আলিঙ্গন করে. গোপালকে দশটা টাকা দিয়ে বিদায় নিল ঘোড়াডাঙ্গা থেকে।

বাড়ি ফিরে বাবাকে, দাদাকে শেষে বৌদিকে কতবার করে যে শিকারের গল্পটা বললো তার ঠিক নেই। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। বন্ধুরা তো এমনই হয়।

এই সময় একদিন শরদিন্দুবাবু আর সুবোধ এল— জমিদারবাবুর নূতন কেনা মটরে। মটর থেকে বেরিয়ে এল জ্যান্ত বাঘের মতই মাউণ্ট করা বাঘ। গাড়ির ড্রাইভার আর সুবোধ নামাল গাড়ি থেকে।

বিজয়বাবু শশব্যস্তে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। বলাই এসেই প্রণাম করল। তারপর সসম্মানে নিয়ে এল বাড়ির ভিতরে।

বাঘকে দালানের একধারে সাজানো হল। তলায় লেখা "বলাইয়ের বাঘ।" সুবোধ যাবার সময় বললো, "আবার ডাক দেব বাঘ শিকারে।"

— ✪ —

দখল

গৌতম লাইব্রেরীতে বসে পড়ছিল। বাইরের বই পড়তে তার ভাল লাগে। আজ থেকে গরমের ছুটির সুরু। গতকাল এতক্ষণ সে স্কুলে যাবার জন্য স্কুল পোষাক পরে ফেলেছে। পিসির ফেরার সময় হয়ে এসেছে।

সুজয় স্যার বলেছিলেন, "এই গরমে লাইব্রেরীতে কেউ আসবে না দুপুরে-তার চাইতে সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখবো। তা তুই যখন বলছিস, তখন কাল আয় ১০টায়-বইগুলো তুই, আমি আর বিনোদ মিলে সাজিয়ে ফেলবো।"

পড়তে পড়তে ভাবছিল গৌতম। সুজয় কাছে এলো, বললো, "এগারোটা বাজে চল্ বাড়ি ফিরি-নইলে তোর পিসি আবার বকুনি দেবে।" গৌতম বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, বললো, "চলুন। তবে পিসি কী আপনাকে বকতে পারে নাকি?" হাসলো।

বছর ১১ বয়স তার ক্ষীনকায় চেহারায় ভারী উজ্জ্বল চোখ। সুজয় ও হাসলেন। বললেন, "কম বয়স হলেও কেউ কেউ রাশভারী হন-তাছাড়া এই যে লাইব্রেরী, ছেলেদের খেলার মাঠ ক্লাবঘর, মন্দির, হাটতলা, বৃন্দসায়র দীঘি-সব তোমার ঠাকুর্দার দান—তাই তোমাদের বাড়ির প্রতি গ্রামের সকলেই শ্রদ্ধাশীল। চলো ভাই, বাইরে এস।' গৌতম হাতের বইটা নিয়ে উঠে পড়লো, বাইরে দাড়া'ল।

রাস্তার ওপারেই তাদের বাড়ি। বিশাল, রংচটা জীর্ণ-এখানে ওখানে বালি খসে গেছে। এতবড় বাড়িতে সে আর তার পিসি কুমারী সন্ধ্যামনি বন্দ্যোপাধ্যায় থাকে। পিসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা—এই গ্রামের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। ভাবলো চোখ বুজে—না পিসিকে কেউ ভয় করেনা শ্রদ্ধা করে। পিসির বয়স হলো ২৬-একহারা খয়াটে চেহারা সুন্দর শান্ত মুখশ্রী।

সুজয়ের চাবী বন্ধ করা হয়ে যেতে বললেন, "গৌতম বাড়ি যা, তোকে ঢুকতে দেখে তবে হাঁটা দেব। দাঁড়া মটর আসছে।' গৌতম তাকালো ডানদিকে এটাই দক্ষিণ দিক-হাওড়ার দিক।

মটরটা এসে দাঁড়াল ঠিক ওদের কাছেই। একজন গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, "এটাই কী ব্রজবন্ধু বাবুর বাড়ি। সুজয় বললেন, হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক কিছু না বলে গাড়িটাকে সামান্য পিছিয়ে রাস্তার ধারে আনলেন, থামালেন, নামলেন-যাকে বলে বৃষস্কন্ধ পুরুষ। গায়ের রংটা তামাটে হয়ে গেছে-পেছনের দরজাখুলে ডাকলেন, "হাই সুব্রত কাম আউট। উই হ্যাভ এ্যারাইভড় হ্যারি আপ।" গাড়ির ভেতব থেকে নেমে এল এক স্মার্ট ইয়ং বয়। বছর ৮/৯ বয়েস হবে।

সুজয় আর গৌতম দেখছিল চুপচাপ। সুজয় বললেন, "গতু তোদের বাড়িতেই এসেছেন মনে হয়, চণ্ডীচরণ বাবুর ছেলে যিনি আমেরিকায় থাকতেন। এবার তোদের এ বাড়ি ছেড়ে দিতেই হবে।"

গৌতম হাসলো, বললো, "জানি-পিসি আর আমি একমাসের মধ্যে স্কুলের ওখানে চলে যাবো। তবে পিসি এত সহজে দখল ছাড়বে না। দেখি, যা হবার হবে, যাই ওদের নিয়ে যাই।"

কাছে গিয়ে বললো, "আমি ব্রজবন্ধু বাবুর নাতি গৌতম—কি করতে পারি বলুন।" ভদ্রলোক তাকালেন তার দিকে তারপর বললেন, "হাই সুব্রত ,কাম হিয়ার-হিয়ার ইজ এ ফ্রেণ্ড অফ ইউ।" সুব্রত বললো, বাবা ডোণ্ট স্পীক ইংলিশ—আমি তো ভাল বাংলা বলিনা বাট বুঝিতো।" ভদ্রলোক হাসলেন, সুজয়ের দিকে হাতজোড় করে বললেন, "আমি শুভব্রত" চট্টো-

পাধ্যায়—বাবা চণ্ডীচরণ ছিলেন ব্রজবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।”

সুজয়ও যুক্ত করে জানালেন “আমি সুজয় দাস, স্থানীয় হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক—পুরাতন অধিবাসী তাই এসব বিবরণ জানি। বিনোদ এই ঘরে থাকে—ওইটা গ্যারেজ—গতু যাও বিনোদকে ডেকে আনো—সে মনে হয় দীঘিতে মাছ ধরছে।”

গৌতম এতক্ষণ এই শ্বেতাঙ্গ বালকটিকে দেখছিল—বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তাকে ডাক দিল—“কাম উইথ মী” সুব্রত কী ভেবে চলে এল তার কাছে, বললো, “দীঘি কি আছে?” গৌতম বললো “লুক ইটস এ বিগ পণ্ড—আই নো এ লিটল ইংলিশ।” ব্রাশ করলো—তারপর চলতে শুরু করে দিল। সুব্রতও সঙ্গ নিল, বললো, “বাংলা বলিতে পারি, বুঝিতে পারি বাংলাতো আমার মাতৃভাষা—আমার মা তো বাঙালীই ছিল—বাট সী ডায়েড-আমেরিকায় তো বাংলা চলেনা।”

গৌতম দুঃখ পেল, ছেলেটির মা নেই জেনে, বললো, “আয় হ্যাড অলশো লষ্ট মাই ফাদার এ্যাণ্ড মাদার ইন মাই চাইল্ডহুড।” সুব্রত তাব হাত ধরে বললো, “বোথ! দেন হাট ডুয়্ লীভ—কাহার কাছে থাকো?”

গৌতম চলা থামালোনা, বললো, “থাকি পিসির কাছে—এই দেখ দীঘি। এটার নাম তিনবিঘার দীঘি। এই দীঘির পাড়ে কত বড় বাগান, বাগানে কত ফলের গাছ।”

সুব্রত ছায়াবৃত সেই বাগানকে নয়ন মেলে দেখতে থাকলো। গৌতম ভাবতে থাকলো এতদিন এই সবের মালিক ছিলাম আমি—আজ থেকে এই সুব্রত হবে মালিক। পিসি এদের ঠেকাতে পারবে না—এরা দখল নেবেই।

সুব্রত প্রশ্ন করলেন, “হোয়ার ইজ বিনোদ দাদা?”

গৌতম বললো, "আছে ঘাটের পৈঠায়। দেখো না কত গাছ এখন সামনে, সব গাছে ফল হয়ে আছে—আম, জাম, জামরুল বেল, কয়েৎবেল, তেঁতুল—কত রকমের লেবু দ্যাখো, সত্যি, তাই আজ থেকে তোমার হলো।"

সুব্রত হাসলো, "আমার হলো? তুমি আমায় দিয়া দিলে কী হইবে। আমার বাবা আছে, জ্যাঠামহাশয় আছেন জ্যাঠাইমা আছেন, দাদা আছেন দিদি আছেন। দাদাটার নাম আছে রূপেশ -দিদিটার নাম এস এন আই জি ডি এইচএ— সিনধা -গৌতম হাসলো, বললো, "স্নিগ্ধা—বললো "স্নি গ-ধা বলো।" সুব্রত হেসে বললো 'আমি পিত্তরলি দিদি বলি।"

বিনোদকে দেখতে পেয়েই গৌতমের মন পাল্টে গেল। এ্যাইরে ভদ্রলোক খাঁ খাঁ রোদ্দুরে—সুব্রত দাও—চেঁচিয়ে ডাকল, "বিনোদদা তাড়াতাড়ি যাও, গ্যারেজের দরজা খুলে দাও, আমি ছিপ দেখছি—পিসিকে বলে দিও ঘাটে আছি।"

বিনোদ সুব্রতকে দেখেই ছিপ ফেলে দে দৌড়। তাকে আগেই জানানো ছিল যে ছোটবাবু আসবেন। সব প্রস্তুত করে রেখে দশটায় এসে বসেছে মাছ ধরতে। একটা মাছ পেয়েছে জিইয়ে রেখেছে জালের ভেতরে।

বিরাট বাঁধানো ঘাট। ছিপটা হাতে নিতে সুব্রত গৌতমকে বললো, "তুমি এ্যাংলিং জানো? সাঁতার জানো। এই দীঘিতে আমি সাঁতার কাটিব—জানো আমি ভাল সুইমার আছি। চাইল্ডগ্রুপে একবার ডিষ্টিক্ট চাম্পিয়ান হইয়াছি।"

গৌতম বললো, চুপ করিয়া বসো—ফাৎনায় চোখ রাখ—তোমার পিতার আদেশ ব্যতীত এই জলে তোমার নামা উচিত" নয়। সুব্রত বললো, "ইয়েস-সো ইট ইজ-হি ইজ এ হার্ড ম্যান—বাট লাভস মী ওয়েল—আইদার হি মাইট হ্যাভ

ম্যারি এগেন।" গৌতম অবাক নয়নে তাকাল, ভাবল, এইটুকু ছেলে কী করে এসব ভাবে! কথা না বলে মাছ ধরায় মন দিল। এবং অচিরেই ফাৎনা ডোবায় খ্যাঁচ মারলো—হুইলের সুতো টেনে নিয়ে চললো মাছ। গৌতম নার্ভাস হলো—সুতো আটকাতে চাইল, বললো, "এ্যাই সুব্রত-গো এ্যাণ্ড কল পিসি গো ফ্রম দিস সাইড প্লীজ গো-না হলে এতবড় মাছটা পাবোনা।" গৌতম হুইল গোড়ায় আর মাছ টেনে পালায়।

সুব্রত বন্ধুর বিপদে কী করে-ফুট পঁচিশ দূরেই একটা দরজা-তাই দিয়ে ঢুকে জোরগলায় ডাকলো, "পিসি।"

সন্ধ্যামনি ভাবছিল লাইব্রেরীতে গিয়ে সুজয়কে আর গৌতমকে বকুনি দেবে। সময়ের খেয়াল নেই-এসে পড়তেও পারে বটে দুজনেই যেমন গুরু তেমনই চ্যালা'-হঠাৎ শুনলো 'পিসি।'

অপরিচিত গলায় ডাক শুনে তাকিয়ে দেখল অনিন্দ্যসুন্দর শুভ্রকায় এক বালক। প্রশ্ন করল 'তুমি কে?' সুব্রত বললো, 'গৌতম সেণ্ড মী হিয়ার-আর য়ু পিসি? দেন কাম সার্প, হি হ্যাজ এ্যাংগেলড এ বিগার ফিস।'

সন্ধ্যামণি এসে গেল সুব্রতর কাছে-তার গালে একটা হামি খেল। তারপর বললো, "চলো তো দেখি কেমন বিগার ফিস।"

গৌতমের তখন ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা—হুইলের সব সুতো-টাই টেনে নিয়েছে মাছে। সন্ধ্যা ছিপ হাতে নিয়ে বললো "এত সুতো ছাড়লি কেন?" বলে সুতো গুড়াতে থাকল।

সুব্রত বললো, "ইজ সী এ গ্রেট এ্যাংগলার!" গৌতম বললো, "পিসি এমন অনেক কিছুই পারে যা অন্যেরা পারে না। নাউসী হার।" সন্ধ্যা বললো, "এত ভয় পাবার কী আছে-খুব একটা বড় নয়-সের দুই আড়াই হবে, জলেতে মাছের জোর বেশি—গতু দেখতো, বিনু মনে হয় মাছ পেয়েছে একটা জালে

রয়েছে-" বলছে আর হুইলের সুতো গুড়োচ্ছে আবার সামান্য ছাড়ছে।

গৌতম জলের কাছে নেমে জালটা তুললো। সুব্রত মাছ দেখে খুব খুশি-'হাট লাভলি-রুই মাছ আছে না?' গৌতম মাথা ঝাঁকিয়ে বললো. 'হ্যাঁ.' ওরা মাছটাকে জালের ওপর দিয়েই ধরতে চেষ্টা করতে থাকলে—ডাঙ্গাতেও মাছটা লাফিয়ে লাফিয়ে সরছে—

এমন সময় আরো বড় একটা মাছ আকাশ থেকে পড়ল যেন—বঁড়শিতে গাঁথা। সন্ধ্যা মাছটাকে খেলিয়ে কাছে এনেই এক খ্যাঁচ দিয়েছিল। মাছটা ভ্রুবন্ধুর কাছে গিয়ে পড়লো। সন্ধ্যা দ্রুত এসে মাছের চোখ টিপে ধরে অন্যহাতে বঁড়শি খুলে নিল। মাছটাকে জালে ঢুকিয়ে দিল।

এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল সন্ধ্যা। এখন গৌতমকে প্রশ্ন করলো 'এই সুন্দর ছেলেটা কে?' গৌতমও লজ্জা পেল, বললো সব ভুলগেছি। জানো পিসি এ হলো শুভব্রত কাকার ছেলে এর নাম সুব্রত—শুভব্রত কাকা এসেছেন বলতে ভুলে গেছি মাছের জন্য।"

সুব্রত বললো. 'হাউ ডু য়ু নো মাই ফাদার?' সন্ধ্যা হেসে বললো "জানি চলো তোমার বাবার কাছে।" বলে মাছের জালটা অবহেলায় নিয়ে বাড়িতে ঢুকলো।

সুব্রত বাড়িতে ঢুকে দেখল বিরাট এক হল ঘরে একটা বড় টেবিলের সামনে বাবা বসে আছে। সে গৌতমের হাত ছেড়ে এক দৌড়ে চলে গেল শুভব্রত কাছে বললো, "লুক ফাদার লুক তু বিগ ফিসেস—পিসি ইজ এ গ্রেট এ্যাংগলার, গতু দাদা কাণ্ট. পিসি স্ন্যাচড্ দি বিগার ফিস ইন এ মোমেণ্ট।" ইজ ইট নট এ বিগার ফিস?" বলে ছুটে গিয়ে মাছটা দেখাল

শুভব্রত বললো, "ইয়েস মাই বয়—কামটুমী—বী সিটেড।" সুব্রত কাছে যেতে তাকে কোলে তুলে বসালেন। সে লজ্জা পেয়ে ছটফট করতে থাকল। বললো, "আমি পিসির কাছে যাইব। দীঘিতে সাঁতার কাটিব।" শুভব্রত বললো, "নো- নট নাউ। সিট এ্যাণ্ড হ্যাভ সামথিং, কিছু খাও।" শুভব্রতর কথায় চোখ ছলছল করতে থাকল। বললো, "গাড়িতে তো বিস্কুট খাইয়াছি।"

সন্ধ্যা বললো, "সুব্ সোনা এখনও খেতে দেরী আছে—এখন দুটো মিষ্টি আর ডাব খাও। গোতু যা বন্ধুকে খাইয়ে দে।" তারপর শুভব্রতর দিকে তাকিয়ে বললো, "বিনু আমার কাছেই খায়—আপনাদেরও কদিন তাই খেতে হবে। আজ হাটে মাছ পাওয়া যায়নি তাই বিনুকে মাছ ধরতে পাঠিয়েছিলাম। বিনু, বাবুকে ডাব কেটে দে – মিষ্টি দে।" বলে ভিতরে চলে গেল।

শুভব্রত কথা বলতে পারলেন না। ভাবলেন, সেই ছিচ-কাঁদুনে সন্ধ্যা এখন কী গম্ভীর। সুব্রতকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন, "যাও গৌতমের কাছে।"

গৌতম তখন অভ্যস্ত হাতে ডাব কেটে ফেলেছে। বিনু একটা ডিসে এনেছে সন্দেশ আর রসোগোল্লা। বললো, "আপনারা আসবেন জেনেই আনা হয়েছে। এসো সুব্রত খাও।" সুব্রত খেতে উদ্যত হতে গৌতম বললো, "সুবু চল আগে কলঘরে গিয়ে হাতধুয়ে এস—মাছ ঘেঁটেছ না?" সুব্রত লজ্জা পেল বললো, "ইয়েস।" বলে বিনুর পিছন পিছন কলঘরে গেল। হাত ধুয়ে এসে বলল, "গতুদাদা বেসিন নাই তোমাদের? এত সুন্দর বাড়ি ইলেকট্রিক পাখা, স্নানঘর, বেসিন নাই?"

গৌতম বললো, "কি জানি ভাই আমি বা আমার বাবা তো কিছু করেনি আমার ঠাকুর্দা এসব করেছেন—হয়তো তাঁদের আমলে বেসিনের ব্যবহার ছিল না।"

সুব্রত বিজয়ের মত বললো "দ্যাট সেবী।" বলে দুটো সন্দেশ খেল। বাবাকে বললো, "ফাদার তুমিও খাও—তুমিও তো কিছু খাও নাই।" শুভব্রত হাসলেন বললেন "হ্যাঁ, খাবো তুমি খাও—রসোগোল্লা খাও—তারপর ডাব খাবে।"

ডাব খাবার পর গৌতমকে বললো, "তুমি খ ইবে না?" গৌতম বললো "হ্যাঁ খাবো—বিনুদা," বিনোদ তখন সুজয় সারকে এবং শুভব্রতকে ডাব কেটে দিচ্ছিল। বিনোদ বললো, "তুমি সুব্রতকে নিয়ে ওপরের ঘরে যাও—ওখানে গল্প করো। পিসি বলেছেন আজ আর দীঘিতে স্নান হবে না। দুপুর অনেক গড়িয়েছে মাছটা হয়ে গেলেই খেতে বসতে হবে।"

গৌতম বললো, "আমার স্নান তো হয়ে গেছে ভোরেই। ভাইয়ের হয়নি হয়তো?" ভাই বলায় সুব্রত প্রথমে বুঝতে পারেনি—শুভব্রত বললেন, "হ্যাঁ সুব্রত স্নান করে এসেছে। গৌতম বললো 'তবে যে দীঘিতে সাঁতার কাটতে চাইছিলে!" তাকাল সুব্রতর দিকে। সুব্রত বাবার দিকে তাকালো লাজুক মুখে। শুভব্রত বললেন "সুব্রত সাঁতার কাটতে ভালবাসে। দিল্লিতে কলকাতায় মিলে একমাস প্রায় এসেছি—কোথাও সাঁতার কাটতে পায়নিতো—তাই এখানে জল দেখে সাধ হয়েছে। আজ নয়, কাল কেমন?"

গৌতমের ডাব খাওয়া হতে সুব্রতকে নিয়ে ওপরে গেল। গৌতম বললো, "আজ আমি বিনুদা আর পিসি মিলে ঘর দুটো পরিস্কার করেছি তোমরা আসবে বলে। অন্যদিন এসব ঘর বন্ধ থাকে। আমি আর পিসি নীচের একটা ঘরেই থাকি।

ওপরে বিশেষ আসি না।”

সুব্রত তখন মুগ্ধ চোখে ঘরের ভিতরকার ছাদের খিলানের থামের কারুকার্য দেখছিল। বললো, “কি সুন্দর। সিনেমায় দেখা প্রাসাদের মতো।” গৌতম বললো, “তোমার ভালো লাগছে? আমার ভাল লাগে।”

দুজনে জানলার কাছে গেল জানলার বাইরে তাকিয়ে বললো, “গোতু দাদা — আমরা কি ওই ঘাটটায় ছিলাম?” গৌতম বললো “হ্যাঁ,” সুব্রত জানালা থেকে বাইরে দেখতে থাকল বাগান, দীঘির ছায়া দেখে জলের নীচে মাছ খেলা করছে-চুপ করে দেখতে থাকল।

গৌতম পিসির কাছ থেকে জানে যে এই বাড়িটা, এই জমি, দীঘি সব ছেড়ে দিতে হবে। তার ঠাকুর্দার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সুব্রতর ঠাকুর্দার কাছে তিনি ঋণ করেছিলেন- শোধ না করতে পারলে এই সম্পত্তি চলে যাবে চণ্ডীচরণবাবুর হাতে। দুজনেই গত। তার পিতা মৃত, পিসি ঋণ শোধ করতে পারেনি কিন্তু দখল ছাড়েনি ছাড়তেও চায় না। বলেছে- ‘টাকা শোধ করে দেব-মায়ের গহনা বৌদির গহনা, আমার গহনা সব বিক্রি করেও বাঁচাবো এই বসতবাটী। গৌতমকে এই বাড়ি ছাড়া করবো না।’ ওরা তা শুনতে চাইছে না ম্যানেজার জ্যাঠা বলেছেন, বাড়িই চাই টাকা দেবার সময় একবছর আগেই শেষ হয়ে গেছে।’

পিসিকে তো গ্রামে সবাই দেবী ভাবে। বাচ্চারা তো এত ভালবাসে যে ভাবাই যায় না। প্রধান শিক্ষিকা বলে ভয় পায় না। ফলে, পিসিকে বাড়ি থেকে সরানো যায়নি। আজ শুভকাকা এসেছেন-তিনি নাকি ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। এ বাড়িতেও এসেছেন অনেকবার। বাবাও নাকি, কোলকাতায় ওদের বাড়িতে থেকেই কলেজে পড়তেন। দ্যাখো-বন্ধুত্ব কিছুই

নেই বন্ধুপুত্রকে গৃহছাড়া করা কী বন্ধুত্ব? অবশ্য ওনার কি দোষ! সুধাব্রত জ্যেঠুই আসল। ইনি তো ছিলেন আমেরিকায়। সুব্রতর মাকে বিয়ে করায় চণ্ডীদাদু খুব আঘাত পান এবং কিছুদিন পরেই মারা যান।

ভাবনা থামিয়ে দেখল, সুব্রত উন্মন হয়ে তাকিয়ে আছে বাগানের দিকে, বলল, "কি দেখছ সুবু?" সুব্রত বললো, "দিঘী দেখিতেছি-জল জলের নীচে মাছ-সাঁতার কাটতে ইচ্ছা করিতেছে।" গৌতম বলল "আজ তা হবে না ভাই-কাল সকালে পিসির সঙ্গে সাঁতার কাটবো? সুব্রত অবাক হয়ে বললো, ইজ সী এ সুইমার অলসো? গৌতম বললো, "না না তবে ভাল সাঁতার জানেন—মেয়েলী সাঁতার আরকি। যাকগে শোনো নীচে চল, তোমায় একটা ফটো দেখাই তোমার বাবার ফটো—তোমার ঠাকুদ'ার ফটো।"

সুব্রত বললো, "আমার বাবার ফটো গ্র্যাণ্ড পার ফটো? ইন দিস হাউস? লেটস মী ইট।" দ্রুত পায়ে নেমে এল। দেখল শুভব্রত একা বসে খবরের কাগজ দেখছেন। সুব্রত বাবাকে গিয়ে বললো, "ফাদার—কাম এ্যাণ্ড সীয়োর ফটো গোতুদাদা সো ইট।"

গৌতম তখন ফটোর নীচে দাঁড়িয়ে, বললো "কাম হিয়ার এ্যাণ্ড লুক।" শুভব্রত ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে বললো, "গৌতমের বাবা আমার বন্ধু ছিল গৌতমের ঠাকুদা তোমার ঠাকুদা বন্ধু ছিলেন।" ফটোর কাছে এসে বললেন, 'বারো বছর আগেকার তোলা গৌতম এইটাই তোমার পিসির ফটো—কতটুকু আর কী ছোট্ট।"

গৌতম হাসলো, বললো, "দেখছ—কত তফাৎ।" শুভব্রত বললেন, 'হ্যাঁ সময় মানুষকে কত পাল্টে দেয়।" ভাবলেন, এই

সন্ধ্যা তখন আমায় কত ভালবাসতো। আমি আমেরিকা চলে গেলাম পড়তে। সহেলীকে বিয়ে করলাম। সব ভুলে গেলাম। সুব্রত হলো—সহেলী মারা গেল কী কষ্ট—তবু চাকুরী ছাড়তে পারছিলাম না—দাদা সম্পত্তি ভাগের কথা বলে চিঠি পাঠাল, এলাম। আমেরিকা ভাল লাগছিলনা—তাই চাকরী ছেড়েই এলাম। এখন দাদা বলছে ব্যবসা দেখ— দিল্লিরটা দেখবে দাদা কোলকাতারটা আমি। তাই সই। এখন এই ফ্যাকড়া— বললাম দাদা কী হবে সন্ধ্যাকে গৃহছাড়া করে—থাকনা যেমন আছে। ওটুকু টাকার জন্যে কী দরকার। বৌদি বলেছিল, তবে ওই সম্পত্তি তোমার ভাগে রইল - তুমি তার বদলে এখানে ভাগ কম পাবে। কী জাহাবাজ মহিলা। কী যে করি?

গৌতম বল্লো "আমরা তাহলে পিসির কাছে যাই।" সুব্রত বললো, "পিসি বিরক্ত হইবেন না?' গৌতম হাসল বললো পিসি বাচ্ছাদের ওপর রাগেনা—বড়দের ওপর রাগে। স্কুলের বাচ্ছারা তো পিসির হাতে কাঁধে কোলে পিসি হাসে- অন্য দিদিমনিরা বাচ্ছাদের তাড়ায়। পিসি তাদের বকে বলে আরে ওদের বকো না ওরা তো আমায় ভালবাসে।'

সুব্রত বললো ' মিটু-আমিও ভালবাসি। আমি পিসির কাছে থাকিব-পড়িব-কলিকাতায় যাইব না। আমেরিকায় যেমন স্বাধীন থাকিতাম এখানেও তেমনই থাকিব। আমিও কাহাকেও কষ্ট দিব না। অন্যেও আমায় দুঃখ দিবে না। দিল্লিতে দিদি আমার হস্তে দরবাজা চাপিয়া দিয়াছিল।"

গৌতম শিউরে উঠে বলল, "কেনো?" সুব্রত বললো, আমি তো নুতন আসিয়াছি—ভারতীয় কাষ্টম বা ম্যানর তো জানা ছিল না—আমার বইপত্র ফাদার কোথায় রাখিয়াছিল— "আমি উহার বই লইয়াছিলাম—মে বী নট আস্কিং হার, ইয়েট

সী ওয়জ এন্‌রেজড—ড্যাসড্ মী আউট অফ দি রম, এ্যাণ্ড সাট দি ডোর এ্যাব্রাপ্টলি—হুইচ কষ্ট মী এ ডীপ পেন—ইয়েট আয় ডিনট টেল দ্যাট টু মাই ফাদার—হি লাভস মী মোস্ট—হোয়েন আস্কড টোল্ড হিম এ লাই—বলিলাম নিজ দোষে আঘাত পাইয়াছি নইলে ফাদার ভীষণ রাগিয়া যাইতেন। লুক সী লাভস মী নট এ বীট বাট য়ু নান বাট এ ফ্রেণ্ড অফ টু আওয়ার্স—লাভিং মী হার্টিলি! গৌতম তাকে জড়িয়ে ধরলো বুকে গালে চুমু খেল বললো, "চিরদিন ভালবাসিব ভাই। তোমার বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন—এখন থেকে আমরাও বন্ধু হলাম।"

সুব্রত গৌতমের হাত ধরে বললো, "প্রমিশ!" গৌতম বললো, "প্রমিশ" শুভব্রত হাসলেন। বললেন "কি ব্যাপার!" সুব্রত বাবার বুকে এসে বললো, "বাবা আমরা দুজনে বন্ধু হলাম।" শুভব্রত বললেন "বন্ধুকে দুঃখ দিতে নেই।" সুব্রত বললেন "আয়নো ফাদার।"

দুজনে সন্ধ্যার কাছে চলে গেল। সন্ধ্যা তখন মাছের ঝাল করছিল। দেখে হাসল বলল, "কি সুব্র সোনা খিদে পেয়েছে নাকি?" সুব্রত লজ্জা পেল—তবু বললো "না পিসি গল্প শুনিতে আসিলাম। বাবার ফটো দেখিলাম, তোমারও।" সন্ধ্যা বললো "তখন তোমার বাবা প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ি। আমার দাদা বিমল ভূষণ, গোতুদাদার বাবা তোমাদের কোলকাতার বাড়িতে থেকে পড়তেন। তোমার ঠাকুর্দা আমার বাবার মৃত্যুর সময়ে এ বাড়িতে ছিলেন। খুব বন্ধুত্ব ছিল আমাদের।"

সুব্রত বললো, "আজ আমরা দুজনেই বন্ধু হইলাম। গোতুদাদা হ্যাজ প্রমিশ" সন্ধ্যা বললো, "বাঃ ভাল কথা এখন

ঘরে এসো গল্প করো। দুপুরে আহার শেষে গল্প বলব কেমন।" গৌতম বললো, "চল আমার ঘরে বসিতো।"

সুব্রত বললো, "এই তোমার ঘর? বা, কিন্তু-না-এইতো" বলে জানালার কাছে গেল "এইটা উপরের ঘরটির ঠিক তলায় জাষ্ট বিলো?" গৌতম বললো, "হ্যাঁ। এই ঘরে আমি আর পিসি থাকি। আমি খাটে—পিসি নীচে এ্যাই দ্যাখো পিসির বই—এইটা আমার আলমারি এখানে আমার সব বই থাকে।'

সুব্রত বললো- "আমার বই আছে ফাদারের ব্যাগে- -লাগেজে। দ্বিতীয় ভাগ আছে।" গৌতম বললো, "তবে তো অনেকটাই শিখে ফেলছ - এক মাসেই এতটা এগিয়েছ।"

সুব্রত বললো, "কেন আমার মাতো বাঙালী ছিলেন— আমেরিকায় বাবাতো আমার সহিত বাংলাই বলতেন। মা তো মাকে আমি মনেই করিতে পারি না।" বলে কেঁদে ফেললো। গৌতম বললো- 'কাঁদতে নেই এই দেখনা আমারতো মা নেই- আমিও দুঃখ পাই তোমার তবু বাবা আছে -আমার তো তাও নাই।" সুব্রত বললো "পিসি আছেন না?"

গৌতম বললো, "হ্যাঁ পিসিই আমার বাবা পিসিই আমার মা।" সুব্রত বললো, "আমার ফাদারও তাই। তবে খুব কঠিন আছেন।" গৌতম বললো- "পিসিও মাঝে মাঝে খুব রেগে যায়। তখন খুব ভয় করে।" সুব্রত বললো, ' আমাকে বকিবেন।"

গৌতম বললো, "তখন বললাম না—পিসি ছোটদের ওপর রাগেন -তাদের বকে না। আমায় ভালবাসে-তোমায়ও ভালবাসে।' সুব্রত বললো, "আমি কাল পিসির সহিত সাঁতার কাটিব।" গৌতম বলল, "আমিও। তবে সকালে অনেক কাজ—আম কুড়ানো আছে—পড়া আছে—পরে বিনুদাদার সঙ্গে স্নান করিব।"

সামান্য পরেই বিনোদ এসে বললো, "হাত পা মুখ ধুয়ে টেবিলে -বসো শুভকাকা এসে গেছেন চলো পিসি বলেছে খেতে হবে।" "গৌতমও বললো, চলো।" সুব্রত বললো, "না পিসি না এলে যাবো না।" বসে রইল খাটের ওপরে।

গৌতম হাত ধুতে গেল। বিনোদ হেসে চলে গেল। সন্ধ্যা এসে বললো, "চল সুবু সোনা এস।" বলে দুহাতে বলিষ্ঠ সেই শিশুকে বুকে তুলে নিল—বসালো এনে চেয়ারে- সুব্রত খুব লজ্জা পেল। সন্ধ্যা বললো, "এখন লজ্জা পাচ্ছ কেনো দুষ্টু ছেলে খেতে হবেনা ? কত বেজে গেল।" বলে বিনোদকে ডাক দিল। "বিনু সুবুর হাত ধুইয়ে দিয়ে যা।" সুব্রত তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়াল বললো, 'নো, আমি যাইতেছি।" বাবার সামনে তার নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হচ্ছিল।

শুভব্রত বললেন, "খুব জ্বালাতন করছে তো?" সন্ধ্যা হাসলো বললো, "না। ছোটরা তো ছোট ওরা জ্বালাতন করে না।" শুভব্রত বললেন, "ভেবেছিলাম ওকে রেখে আসি- কিন্তু ওর জ্যাঠাইমা, ওর দাদা দিদি ওকে পছন্দ করে না—ওর সাথে কথা বলে না মেশে না—তাই নিয়ে এলুম। এখানে ও বেশ সহজ আছে। আমেরিকায় যেমন ছিল তেমনই।'

গৌতম বললো "আমেরিকার গল্প বলুন না কাকাবাবু।" শুভব্রত বললো, "দুপুরে বলবো।" সুব্রত ফিরে এসেছিল, "বলল, না দুপুরে আমরা পিসির গল্প শুনবো বাবা।" শুভব্রত বললো "পিসি ঘুমুবে।" সন্ধ্যা বললো "না ঘুমাই না। পড়াশোনা করি।"

সুব্রত বললো, "পিসি তুমি তো প্রধান শিক্ষিকা আছ—আবার পড় কেন?" সন্ধ্যা হাসলো বললো "প্রাইমারী স্কুলের বাবা তাছাড়া শিক্ষার তো শেষ নেই বাবু। কাল সকাল থেকে তুমিও পড়বে সুজয় স্যারের কাছে। গোতু পড়ে—সে ফার্ষ্ট

হয়—তোমাকেও হতে হবে।"

সুব্রত বললো, "আমি কী এখানে থাকিব ফাদার।" শুভব্রত বললেন, "তোর কি ইচ্ছে?' সুব্রত বললো. "থাকিব—কী সুন্দর বাগান, দীঘি. সামনেই লাইব্রেরী. মন্দির, খেলার মাঠ—গতুদাদা গতুদাদা তোমার বন্ধুরা আমায় ভালবাসিবেনা?

গৌতম বললো "কেন বাসিবেনা—তুমি কী সুন্দর, নাও খেতে শুরু কর।" বলে অন্নে হাত দিল। সন্ধ্যা বল.লা, ' আমি সুব্ সোনাকে খাইয়ে দিই কেমন? বিগার ফিসের মুড়োটা খেতে হবে তো।" সুব্রত লাজুক হাসলো—কিন্তু সন্ধ্যাকে বাধা দিলনা

শুভব্রত বললো, "খাবার ছড়ায়—আজ কেমন জব্দ।" সুব্রত বললো "ছড়াবো না।" সুব্রতরই সবচেয়ে দেরী হল। গৌতম দ্রুত খেয়ে নিয়েছিল—শুভব্রতও। তাই তিনি গৌতমকে বললেন, "চলো গৌতম -ওপরের ঘরে যাই।" গৌতম বললো "চলুন।"

ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন, "ভাইকে কেমন লাগছে?' "খুউব ভাল কাকাবাবু—ওকে এখানে রেখে যান। পিসির কাছে ঠিক থাকতে পারবে। তারপর আপনারা তো এসেই যাবেন। আমরা চলে যাব -বেশী দূরে নয় - স্কুলের পাশেই।"

শুভব্রত বললেন, "তোমার পিসিকী বাড়ি ছেড়ে দেবেন?" গৌতম বললো, ' কী করবো বলুন—আমার কে আছে? আপনাদের সাথে মামলা করবে কে? তবে দোহাই, বাড়িটা ভাঙবেন না!" শুভব্রত দেখলেন, গৌতমের চোখে জল। বললো "জমি বাড়ি দখল নিতে পারবো না। আমি যদি থেকে যাই, ধরো বিনোদের ঘরের পাশেই একটা ইলেকট্রিক গুডসের দোকান দিই—তাহলে চলবেনা।"

গৌতম অবাক হল। পরে বলল "হ্যাঁ এখন তো অনেকের

বাড়ি ইলেকট্রিক আসছে। কিন্তু সে কেমন করে হবে? আপনি আমেরিকা ফেরৎ—এত ধনী লোক আপনি! তার চাইতে না সে হতে পারে না।" শুভব্রত বললেন, 'তার চাইতে কী? গৌতম বললো, পিসি বলছিল যে দীপনলাল সিংঙীকে বাগান আর দীঘি বিক্রি করে আপনাদের টাকা শোধ করে দেবে। কাকাবাবু আপনারা কত টাকা পান?"

"তোমার পিসি বলেননি?" "বলেছেন— ঠাকুর্দা নিয়েছিলেন ৮০০০ টাকা সেটা এই বারো বছরে কতটাকা হতো?' শুভব্রত বিব্রত হলেন বললেন, "ওসব দাদা আর ম্যানেজার জানে আমি জানি না। বৌদি বলেছেন দখল করতে না পারলে তোমার সম্পত্তি থেকে তা মাইনাস হবে' হোক,-বিমলের ছেলেকে আমি গৃহছাড়া করতে পারবো না বাবা।" বলে গৌতমকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন শুভব্রত সামালালেন। হতভম্ভ গৌতমকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বিমল আর আমি বন্ধু ছিলাম- তাতো জান ই। আমেরিকায় গিয়ে সব পাল্টে গেল। অনেক কিছুই নষ্ট করেছি। পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি-প্রয়োজন কুলি গিরিও করেছি। সব নষ্ট হলেও গোতু পেয়েছিও অনেক-পেয়েছি সুব্রতকে তার মাকেও পেয়েছিলাম। কিন্তু সে তো সুব্রতকে জন্ম দিয়েই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। তারও পরে কয়েকটা বছর তাদের মত আমেরিকায় কাটালাম সবাই কাজ চায়-সবাই অর্থ চায়। মানুষ যেন প্রাণহীন যেন যন্ত্র এক কাজ তার বিনিময়ে অর্থ সুব্রতকে ফেলে রেখে যেতাম চাকুরীতে সে সারাদিন কাঁদত। এমনসময় দাদার চিঠি পেলাম। ভারতবর্ষে ফিরলাম। এখানে কোথাও জায়গা নেই সুব্রতর। তার মা খৃষ্টান ছিল এই তার অপরাধ। কেউ তাকে ভালবাসেনি। দাদার ছেলেমেয়ে ভোবছে ভাগীদার এসেছো এখানে এসে সে একদিনেই কত পাল্টে গেছে। আমার খুব

ভাল লাগছে এই গ্রামকে। সার্থক নাম আনন্দনগর।"

গৌতম বললো, "কাকা আপনি তবে থেকেই যান এখানে। বিনোদাদাকে দোকান করে দিন–সে চালাবে। আপনি দেখিয়ে দেবেন। গ্রামের সবাই আপনাকে মানবে ভক্তি করবে। আজই তো গ্রামপ্রধান হরিকৃষ্টবাবু, হারুজ্যাঠা, সুজয় স্যর, হেডমাষ্টার মশাই সব আসবেন সন্ধ্যার সময়ে।"

শুভব্রত বললেন, "হ্যাঁ জানি আচ্ছা যাও এখন ভাইকে দেখো। দেখে তার মুড়ো খাওয়া হয়েছে কি না। গৌতম বললো "আসছি।"

নীচে নেমে দেখলো, পিসি কোলে করে কলঘর থেকে সুব্রতকে আনছে। বললো "এ্যা, বাবা, বয়সেও কোলে উঠেছ তুমি?" সুব্রত বললো, "ডোন্ট বী জেলাস, রিমেমবার, আই হ্যাভ নো মাদার-আয় হ্যাভ নেভার বীন ইন এনি মাদার্স ল্যাপ।" সন্ধ্যা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

গৌতম বললো, "সো মী টু বাট য়ু আর ইয়োংগার সো আই হ্যাভ নট জেলাস ঐ দেয়ার। সুব্রত ঝপ করে নেমে বললো, "সী ইজ এলাইক মাই মাদার-আই হ্যাভ সীন হার ফটোর সন্ধ্যা ব্লাশ করল। অবশ্য তা বাচ্ছাদের চোখে পড়ল না।

গৌতম বললো "নাউ বী সীটেড লেট পিসি হ্যাভ হার মিল। পিসি টেকস্ ওয়ান মিল ইন এ ডে।" সুব্রত অবাক হয়ে সন্ধ্যাকে প্রশ্ন করল "ট্রু? হোয়াই দেন?"

সন্ধ্যা বলল 'কি করি বল সুবুসোনা তোমার পিসি যে ভীষণ গরীব।" হাসল সুব্রত বললো, "ডোন্ট টেল এ লাই পিসি এইসব কী গরীবদের হতে পারে?" গৌতম বললো "এইসব তো তোমাদের হয়ে যাবে।" সুব্রত বললো, "আমি ইহা লইব না পিতাকে বলিব-হি লাভস মী ওয়েল তিনি লইবেন না।" সন্ধ্যা

বলল, "ছিঃ ওসব বলতে নেই। এসব বড়দের বিষয়-এতে কথা বলতে নেই।"

গৌতম বললো, "শুভকাকাও তাই বলেছেন আমাকে।" সুব্রত বললো "ট্রু, দে সী যু পিসি-য়ু আর নট এ পুওর বাট দ্যাট জ্যেঠিমা সী মে নট লীভ এ পয়সা। সী ইজ গ্রীডি —দ্যাট দিদি—"গৌতম বললো, "স্নিগ্ধা" সুব্রত বললো-"ইয়েস, সী ইজ অলসো ভেরী গ্রীডি।"

সন্ধ্যা বললো, "এসব বলতে নেই বাবা। তারা তাদের দাবী ছাড়বেন কেন? যাও গল্প কর-আমি খেয়ে নিই কেমন?"

সুব্রত বললো, "সরি পিসি টেক য়োর মিল" বলে চেয়ারে বসে পড়ায় গৌতমও বসলো।

শুভব্রত ওপরের ঘরে একা ছিলেন-ভাল না লাগায় বাইরে বের হয়ে দেখলেন, নীচের টেবিলে দেখলেন দুজনকে বসে থাকতে ডাকলেন, "ওপরে এসো।"

সুব্রত দৌড়ে উঠে গেল বাবার কাছে। গৌতমও ও এল ধীর পায়ে। শুভব্রত বললেন, "কি করছিলে?" সুব্রত বললো "নাথিং গতুদাদা বলিয়াছে বিকালে তাহার বন্ধুদের সাথে আলাপ করাইয়া দিবে। জানো ফাদার পিসি দিনে একবার মাত্র আহার করে-রাত্রে আহার করেন না-বলেন তিনি নাকি গরীব আছেন।"

শুভব্রত বিব্রত হলেন, বললেন, "আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না।" সুব্রত বললো, "পিসি তো চাকুরী করেন।" গৌতম বললো, "আমাদের বাড়ি প্রত্যহ কত ব্যক্তি আসেন-বাড়ির মর্য্যাদা রাখতেই অনেক খরচ হয়ে যায়।"

শুভব্রত বললেন, "হ্যাঁ-তাও তো বটেও। তাছাড়া কত কিছু মেনটেন করতে হয়। আচ্ছা, গ্রাম প্রধান কিছু সাহায্য করেন না! আমি যতদূর জানি, তোমার ঠাকুর্দা তোমার ব্যবস্থার

ভার তাদের ওপর দিয়ে গেছেন।" গৌতম বললো, "পিসি বলেছে, সে সব গোতু নেবে আমি মলে। তাই ভয়ে কেউ কিছুই বলে না।"

গৌতম বললো, "কাকাবাব, আপনি আমেরিকার গল্প বলুন।" শুভব্রত বললেন, আমি তা ভাল পারি না। আচ্ছা বলো, কে প্রথম আমেরিকাকে খুজে পেয়েছিলেন" গৌতম বললো, "আমেরিগো ভেপুচি প্রথমে নিউ ফাউণ্ড ল্যাণ্ড যান। কলম্বাস তো বর্তমান ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের একটা দ্বীপে যান।" শুভব্রত বললেন "বাঃ তুমি তো সুন্দর বলো। তুমি বরং একটা গল্প বলো। আমি তো বিশেষ গল্পের বই পড়িনি"

সুব্রত বললো, "আমি রবার্ট ব্রুসের গল্প পড়িয়াছি-আমার কাছে ছবি আঁকা বইও আছে। ফাদার আমার বই-গুলি কোথায় -আমি কাল সকাল হইতে গতুদাদার সঙ্গে সুজয় স্যারের নিকট পড়িব। গোতুদ দা বলিয়াছে।"

শুভব্রত "বললেন, ভেরী গুড এ ওয়েল ডিসিসান মাইবয়"

গল্প চলতে থাকলো। সন্ধ্যা সামান্য পরেই ডাক দিল গৌতমকে। সুব্রত বের হয়ে বললো, "পিসি আমরা তিনজন এখন বাগানে যাইতেছি-আমরা সেই তেঁতুল গাছটা দেখিতে যাইব।" গৌতম অপরাধীর মত মুখ করে বললো, "গল্প বলছিলাম শুভব্রত বললো 'আমি তো সঙ্গে থাকছি। সন্ধ্যা বললো." গোতু সুব্রকে সাবধানে নিবি-জুতো পরে যা।"

বাগানে তিনজনে কিছুক্ষণ ঘুরে, সেই তেঁতুল গাছটা দেখল-গৌতম বললো "এই খানে মৃতদেহটা ঝুলছিল কতদিন ভয়ে আমরা বাগানে আসিনি, এই লিচুগাছটায় ফল হয় না এই আমগাছের আম খুব সুস্বাদু-রোজ সকালে অমুরা কোড়াতে আসে।"

শুভব্রত বললেন, 'এবারে চল।" ফিরে এসে ঘাটে বসলেন বললেন; "এই ঘাটে বিমলের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছি।

সন্ধ্যাও আসতো। ও কোলকাতার গল্প শুনতে সে ভীষণ ভালবাসতো। সুব্রত বললো, "বাবা তবে এখন তোমরা গল্প করছ না কেন ফাদার? পিসি তো নাইস আছেন, অলমোষ্ট মাই মাদার-ইজইট নট?" শুভব্রত আবার বিব্রত হলেন, বললেন, "অনেকটা মিল আছে বটে।'

বাড়িতে ফিরে ওরা দুজন সন্ধ্যার ঘরে ঢুকে গেল। শুভব্রত ওপরে চলে গেলেন।

বিকালে মাঠে গিয়ে গৌতমের বন্ধুদের সাথে আলাপ হল, ওদের কেউ ফুটবলার হতে চায়, কেউ হতে চায় ক্রিকেটার, কেউ ভাল ছবি আঁকে, কেউ গান গায়-একজন মাটির পুতুল গড়ে। সুব্রত জানাল "আমি হতে চাই সুইমার।" গৌতম বললো, "আমি টিচার হতে চাই।"

সন্ধ্যায় বাড়ি তে ফিরে দেখে অনেক লোক। গৌতম জানতো। সুব্রতর জানার কথাই নয়। সে ভিড় দেখে বিস্মিত হল,' সুজয় স্যার হাত বাড়িয়ে দুজনকে ধরে নিল কোলের কাছে, বললো "তোমরা ওপরে গিয়ে বসো গে-বিনু খাবার দিয়ে আসবে-পিসি বলে দিয়েছেন।"

সুব্রত বললো, "হাত পা মুখ ধুয়েই যাচ্ছি।" ওরা চলে গেল। গৌতমের শোনার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল, "সুবু, শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার পিসি তো একা।" সুব্রত বললো, "তাহা সত্য নয় এখানে আমার পিতাই একা। বাকীরা তো এখানকার মানুষ আছেন।" গৌতম মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ সেকথা সত্য। তবে পিসি তো কখনো মিথ্যা বলেনা—কী যে আমার ভাগ্যে আছে কে জানে।" সুব্রত বললো, "ভয় পাইবার কিছু নাই-ফাদার ইজ এ রিয়েল ফ্রেণ্ড অফ য়োর ফাদার। লেটস্ গো ইনসাইড।" বলে ঘরের ভেতরে

টেনে নিল গৌতমকে।

বই দেখতে দেখতে গৌতম ভুলে গেল সব কথা-পড়তে থাকল। অনেকক্ষণ পরে শুভব্রত ফিরে এলেন। মুখ বেশ গম্ভীর। সুব্রত ভয় পেল-বললো, „হোয়াট হ্যাপেণ্ড ফাদার।" শুভব্রত বললো "নাথিং আয় ডিম্যাণ্ডেড নাথিং বাট সন্ধ্যা যোর পিসি ইজ প্রেসিং মী টু টেক মানি। হাউ কুড আই?"

গৌতম বললো, "কাকাবাবু একটা কথা বলি কিছুদিন আগে সুজয় স্যার বলেছিলেন, আমার মনে আছে যদি কিছু মনে না করেন তো বলি বড়দের কথা শুনে ফেলেছিলাম তো—"

শুভব্রত বললেন, "কি ব্যাপার বলো-বলো না।" গৌতম লজ্জা জড়িত কণ্ঠে বললো, "সুজয় স্যার পিসিকে বলছিলেম, এখন তো শুভদার স্ত্রী মারা গেছেন সন্ধ্যাদি, তুমি এখন তাকে বিয়ে করতে পারো তাহলেই তো ঝামেলা খতম।—কাকাবাবুর কী ঝামেলা খতম হবে?'

শুভব্রত বললেন, "সুজয় স্যার আজকের সভাতেও সেই প্রস্তাব দিয়েছেন কিন্তু প্রস্তাব মতো কাজ করাটায় সবচেয়ে বড় অসুবিধা সন্ধ্যা এবং সুব্রত—তোমরা ছোট এসব বিষয়ে মন দিয়ো না। বড়দের মনে অনেক কষ্ট অনেক প্রশ্ন জমা থাকে।"

সুব্রত বললো, "ফাদার আই ওয়াণ্ট পিসি এ্যাজ মাই মাদার সী লাভস্ মী ওয়েল উই টু ফ্রেণ্ডস উইল মেক হার এ্যাগ্রীড ফাদার ডোণ্ট য়ু লাভ হার?"

গৌতম তাকাল শুভব্রত দিকে। শুভব্রত বললেন, "এক সময় তো ভালবাসতম, সন্ধ্যাও ভালবাসতো আমায়। তারপর চলে গেলাম আমেরিকায়। সন্ধ্যার রাগ তো হতেই পারে।"

সুব্রত বললো, "না ফাদার সী ইজ ভেরী সুইট আই

অ্যাম গোয়িং টু হার। গৌতমও শুভব্রতকে একা রেখে নেমে এল নীচে দেখল সুব্রতকে কোলে আঁকড়ে নিয়ে বসে আছে সন্ধ্যা—তার পিসি কাঁদছে।

গৌতম এসে বসল পিসির পাশে। পিসি তাকেও জড়িয়ে ধরলো।

গৌতম মনে মনে হাসল, বললো সুব্রত শেষপর্যন্ত সবটাই দখল করে নিলি।" সন্ধ্যা বললো, "না গতু না। তোকে দখল মুক্ত করতে গিয়ে এ বন্ধন না মেনে উপায় ছিল না।

সুব্রত বললো, "মাদার, আমরা সবাই মিলেই এখানে থাকব আমি আর গোতুদাদা তো ফ্রেণ্ড আছি-ফ্রেণ্ড ফর এভার।- প্রমিশ, গৌতমও হাত তুলে বললো প্রমিশ।"

সন্ধ্যামনি সুব্রতকে নিবিড় করে তার কুমারী বুকেই জড়িয়ে ধরল।

— ✪ —